ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অযোধ্যা সিংহ

রেখা প্রকাশন ॥ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

হিন্দী থেকে অনুবাদ
কমলেশ সেন ও আশা সেন

প্রচ্ছদ ঃ
গণেশ বসু

মুদ্রক ঃ
শেখর দে (ম্যানেজার)
নবযুবক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮, নরসিং লেন
কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
রমা সিংহ
রেখা প্রকাশন
১/১ মনি মুখার্জী রোড
কলকাতা-১৯

দেশের সেই সব তরুণদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত, যারা শোষণহীন এবং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দুটি কথা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক লেখা হয়েছে। তাঁরা প্রায়শই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শাসকশ্রেণীর চারণের কাজ করেছেন। তাঁরা প্রায়শই এই দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কংগ্রেস, গান্ধী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের দৌলতে অহিংসার রাস্তায় এসেছে। এই সব রচনায় তাঁরা পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু এবং তাদের প্রতিনিধিদের ভূমিকা খুব বড় করে দেখান। খুব হৃদয়বান হলে তাঁরা মধ্যশ্রেণী বিপ্লববাদীদের কিছুটা স্থান দিয়ে দেন। কিন্তু যখন শ্রমিক কৃষকদের প্রশ্ন এসে যায়, তখন তাঁরা খুব কৃপণ হযে যান। এই রকম দেখান, যেন তাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য।

এই গ্রন্থ সেই অর্থে তাঁদের থেকে পৃথক। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণী সংগ্রাম করে এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের দান ছিল। অবশ্যই তাদের লক্ষ্য এবং কায়দা সর্বদাই এক ছিল না। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে এদের সবার ভূমিকা যথার্থভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা কতদূর পর্যন্ত সার্থক হয়েছে তার বিচার স্বয়ং সহৃদয় পাঠকরা করবেন।

এই গ্রন্থ লেখার সময় বি. টি. রণদিবে, ডঃ মহাদেব সাহা এবং কমঃ শিব বর্মা বহুমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন, সেই জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

১

জাতীয়তা ও জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল জাতীয় মহাবিদ্রোহ। এই মহাবিদ্রোহ ছিল দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রথম সংগঠিত প্রয়াস। প্রধানতঃ সামন্তশ্রেণীর নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্যে এই বিদ্রোহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের ভাবনা একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি।

মহাবিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ভারতবর্ষে তাদের শাসনের কৌশল পরিবর্তন করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন কায়েম হয়। কিন্তু এই পরিবর্তনে তাদের শোষণ এবং দমন-পীড়ন এতটুকু কমেনি, বরং শোষণ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সাত বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে মোট পনের লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ সালের মধ্যে আটাশ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর এই দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে দুই কোটি পচাশি লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই আটাশটি দুর্ভিক্ষের মধ্যে আঠারোটি দুর্ভিক্ষ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পচিশ বছরে।

এই শোষণ দমন-পীড়ন আর দুর্ভিক্ষের জন্যেই দেশে কৃষক বিদ্রোহ হয়। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত বাংলা দেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমের মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভুভাগ জুড়ে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৭৫ সালে মহারাষ্ট্রের কৃষকদের মধ্যে যে ক্রোধ এবং অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে তাতে ইংরেজদের সিংহাসনের ভিত এমন নাড়িয়ে দেয় যে ইংরেজরা বাধ্য হয়ে দক্ষিণের হাঙ্গামা অনুসন্ধান কমিশন (ডেকান রায়ট কমিশন) বসায়। ১৮৭৭ সালে দুর্ভিক্ষ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের মানুষ যখন অন্নাভাবে মারা যাচ্ছিল তখন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী অজস্র টাকা জলের মতো খরচ করে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষিত করে। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভার্নাকুলর প্রেস এ্যাক্ট চালু করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। ১৮৭৯ সালে তারা আর্মস এ্যাক্ট চালু করে ভারতীয় জনগণের আত্মরক্ষার জন্যে হাতিয়ার রাখা বেআইনী করে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে তিনটি শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। এই তিনটি শ্রেণী হচ্ছে শিল্পপতি, কলকারখানার শ্রমিক এবং নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা তাদের মূলধন কাপড়ের কলে নিয়োজিত করে। ১৮৫৩ সালে বোম্বাইযে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ১৮৮০ সালের মধ্যে এই কাপড়ের কলের সংখ্যা বেড়ে ১৫৬তে এসে দাঁডায়। আর এই ১৫৬টি কাপড়ের কলে শ্রমিকের সংখ্যা এসে দাঁডায় ৪৪০০০। ১৯০০ সালের মধ্যে এই কাপড়ের কলের সংখ্যা হয় ১৯৩। আর এই কারখানাগুলিব মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১৬১০০০তে এসে দাঁডায়।

ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ইংলণ্ডে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবং এমনকি কেম্ব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের প্রতিভা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিতে শুরু করে। বাংলা দেশের গভর্নরের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই সফলতায় ভীত এবং সন্ত্রস্ত হযে ভারতীয জনসাধারণের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা করে। ১৮৭৪ সালে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদাযের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠতে থাকে। উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীরা উপলব্ধি করে যে, ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিযার ঘোষণা সত্ত্বেও বিদেশী শাসকরা ভারতীয় যুবকদের ইংরেজদের ন্যায় সমান অধিকার দিতে অস্বীকার করছে। ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অসন্তোষের আগুন জ্বলছিল তা ক্রমেই সংগঠিত রূপ ধারণ করতে থাকে।

১৮৮২ সালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয নবোত্থিত শিল্পপতিদের উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। ল্যাঙ্কশায়ারের কাপড়ের কলের মালিকদের চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে যে সূতী কাপড় রপ্তানী হত তার উপর থেকে সমস্ত শুল্ক তুলে নেয়। ভারতবর্ষের নবোত্থিত শিল্পপতিরা বুঝতে সক্ষম হলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সঙ্গে লডাই করেই তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই লুণ্ঠন, পীড়ণ ও অত্যাচার শুধু ভারতবষের কৃষক সমাজকেই নয় এই নতুন শ্রেণীসমূহের মধ্যেও অসন্তোষের বীজ রোপণ করে দেয়। আর এই অসন্তোষ থেকেই জাতীয় চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যেও এই চেতনা পরিলক্ষিত হতে থাকে। ভারতবর্ষের এই দুর্দশা দেখে হিন্দী সাহিত্যের জনক ভারতেন্দুই শুধু অশ্রু বিসর্জন করেননি, বঙ্গ সাহিত্যকার বঙ্কিমচন্দ্রও আনন্দমঠ লেখেন। এবং অন্যান্য ভাষার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরাও দেশের জনগণকে এই দুর্দশার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন।

এই সব সাহিত্যিকরা ভারতবর্ষের এই দুর্দশার জন্যে বিদেশী শাসন ব্যবস্থাকেও দায়ী করতে শুরু করেন। ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে গুপ্ত সংগঠন তৈরী হতে থাকে। নয়া বুদ্ধিজীবী, নতুন শিল্পপতি এবং শ্রমিক কৃষক সকলেই একসঙ্গে জোট বাধতে শুরু করে। মনে হয় যেন সারা দেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক ফ্রন্ট গঠিত হচ্ছে। প্রগতিশীল জমিদার ও সামন্ত প্রভুরাও এই ব্যাপক মিলিত ফ্রন্টের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়ে যায়।

১৮৭৯ সালে মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত ফারকের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, সেই বিদ্রোহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বলবন্ত ফারকে ছিলেন নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিভূ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনের ভিতকে ধূলায় লুণ্ঠিত করার জন্যে ফারকে গ্রাম এবং শহরে সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি কৃষক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করেন। নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এই প্রতিনিধি কৃষি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে এই বিদ্রোহ ছিল খুবই শুভ, কিন্তু বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে এই বিদ্রোহ ছিল আতঙ্ক স্বরূপ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিদ্রোহী মনোভাবকে যথাসাধ্য দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও এই বিদ্রোহী মনোভাবকে তারা দমন করে রাখতে পারেনি। লর্ড লিটনের রাজত্বের সময়ে (১৮৭৬—১৮৮০) ভারতবর্ষ এক বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ায়। কোন কোন ধুরন্ধর ব্রিটিশ শাসনকর্তারা এই আশঙ্কাকে অনুধাবন করেন এবং এই আশঙ্কাকে প্রতিরোধ করার জন্যে ভারতবর্ষের এই নয়া বুদ্ধিজীবী ও নয়া শিল্পপতিদের কৃষক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন। আর এই আশঙ্কা নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশী চিন্তা করেন তিনি হলেন আলেন অক্টাভিয়েন হিউম।

হিউম ছিলেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার এক ক্ষয়ে যাওয়া স্ক্রু মাত্র। ১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহের সময় হিউম ইটাবাতে কালেক্টরের কাজ করতেন। এবং এই সময় তিনি ইটাবা থেকে নারীর বেশ ধারণ করে পালিয়ে আসেন। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সরকারী কর্মচারী হয়ে তিনি বিভিন্ন জেলায় থাকা কালীন পুলিশের গুপ্ত রিপোর্টগুলি পড়েন। এই রিপোর্টগুলি থেকেই তিনি জানতে পারেন বিভিন্ন জায়গায় যে সব গুপ্ত সংগঠন তৈরী হচ্ছে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উলটে দেয়ার জন্যেই প্রস্তুতি। জাতীয় বিদ্রোহের একটা আশঙ্কা যে ক্রমেই বাড়ছে তা তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। এই জাতীয়

বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ১৮৮৫ সালের প্রারম্ভে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে সিমলায় দেখা করেন। লর্ড ডাফরিন এবং হিউমের মধ্যে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। লর্ড ডাফরিন হিউমের পরিকল্পনাকে কিছুটা রদবদল করেন এবং এই পরিকল্পনাকে কার্যকারী করার জন্যে হিউমকে উৎসাহিত করেন। লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে হিউমের এই মর্মে শর্ত হয় যে, ডাফরিন যতদিন ভারতবর্ষে থাকবেন ততদিন তার নাম কোন প্রকারে প্রকাশ করা চলবে না।[১] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাকে আজকে সবাই কংগ্রেস বলে জানে, সেই কংগ্রেসের জন্মের ইতিহাস হচ্ছে এই। এই ইতিহাস অন্যান্যরাও স্বীকার করে।

হিউম এই পরিকল্পনা নিয়ে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যান। হিউমের এই পরিকল্পনাকে নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় স্বাগত জানান। এই পরিকল্পনা তৈরী হওয়ার পর, ১৮৮৫ সালের শেষের দিকে বোম্বাই শহরে উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এই নতুন বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে এই অধিবেশন শুরু হয়। আর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দিয়েই এই সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের অনেকদিন আগেই ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কিছু কিছু অন্য সংগঠনও তৈরী করেন। যেমন কলকাতায় তৈরী হয় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স (১৮৮৩)। এই দুইটি সংগঠন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্মের পর এই সংগঠনগুলি ভেঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষের বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভৃত্য হিউম কংগ্রেস সংগঠনের জন্ম দেয়। কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে এর ছাপ খুবই স্পষ্ট। এই সম্মেলনে যে নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে প্রশাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু রদবদলের উমেদারী করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য ছিল তাতে বিধান সভায় কয়েকজন নির্বাচিত সদস্যদের নেয়ার কথা বলা হয়। এই অধিবেশনের সমাপ্তিতে মহারাণী

১। ডব্লু. সি, ব্যানার্জী : ইনট্রোডাকশন টু ইনডিয়ান পলেটিকস ১৮৯৮

ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দেয়ার ভার হিউমকে দেয়া হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসী ভৃত্য হিউম এই অধিবেশনে বেশ গর্বের সঙ্গে বলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুতার ফিতে খোলার মতোও তিনি যোগ্যতর ব্যক্তি নন। এবং যারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাদের ভিক্টোরিয়ার সন্তান বলে অভিহিত করেন। সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হিউমের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি করেন এবং তারা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্ভরযোগ্য ভৃত্য তা তারা আরো উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

মডারেট (নরমপন্থী) ও জাতীয়তাবাদীদের যুগ

কংগ্রেসের জন্মের কুড়ি বছর পর্যন্ত কংগ্রেসকে তার জন্মদাতা যে পথে পরিচালিত করেছে কংগ্রেস সেই পথেই গিয়েছে। এই দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কংগ্রেস সাম্রাজ্যশাসনের মৌলিক কোন সমস্যা নিয়ে দাবী করেনি। কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্যে উচ্চ সরকারী চাকুরী এবং বেশী প্রতিনিধিত্বের জন্যে আওয়াজ তোলে। এই সময় কংগ্রেস ছিল বড় বড় ধনীকগোষ্ঠী এবং বিশেষত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পার্টি, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই তত্ত্বগতভাবে ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ছিল। ইতিহাসে এরাই নরমপন্থী বা মডারেট নামে প্রসিদ্ধ। দাদাভাই নৌরজী, স্যার ফিরোজশাহ মেহেতা, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোপালকৃষ্ণ গোখেলে ইত্যাদি এঁরা সবাই সুপরিচিত মডারেট (নরমপন্থী) নেতা ছিলেন। এই সময় নবজাত শ্রমিকশ্রেণী অসংগঠিত ছিল এবং কৃষক সম্প্রদায় ছিল নিশ্চুপ।

এই নরমপন্থীরা বারবার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে, তারা ব্রিটিশের শত্রু নয়, মিত্র। এঁরা প্রশাসন ব্যবস্থায় সামান্য কিছু সংশোধন এবং ভারতীয়দের জন্য কিছু প্রতিনিধিত্ব দাবী করতেন। কিন্তু এই সামান্য দাবীও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। যে ডাফরিন একদিন কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন সেই ডাফরিনও এই কংগ্রেসের নাম শুনে উষ্মা প্রকাশ করতেন। শ্রীমতি এ্যানি বাসেন্টের এক তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৮৭ সালে জনৈক সরকারী কর্মচারী তার জেলা শাসন কর্তার আদেশ অমান্য করে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেয়, ফলে তাকে ২০,০০০ টাকার মুচলেখা দিতে হয়। ১৮৯০ সালে এক সরকারী ঘোষণায় সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে এবং এমন কি দর্শক হিসেবেও উপস্থিত হতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন সেক্রেটারী অব এ স্টেটের কাছে এক চিঠিতে লেখেন "কংগ্রেস এখন কাঁপতে কাঁপতে ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। আমার এক মহৎ ইচ্ছা ভারতবর্ষের প্রবাসী জীবনে আমি কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে সাহায্য করে যাই।" (রোনাল্ডসে, লর্ড কার্জনের **জীবনী,** ইংরেজী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫১) **জীবনের**

শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নরমপন্থী দলের প্রসিদ্ধ নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেলে আক্ষেপ করে বলেছিলেন "ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র বাস্তবতঃ স্বার্থপর এবং ভারতবর্ষের জাতীয় আকাঙ্খার বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিরোধিতা করছে। কিন্তু অতীতে এমন ছিল না।" (ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস, ইংরেজী ১৯৩৫, পৃ ১৫১)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই মনোভাব এবং নরমপন্থীদের অনুনয়-বিনয়ের নীতির অসফলতার জন্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। এই উগ্রপন্থীদের নেতা ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, বাংলা দেশের বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ। আর পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। বাল-পাল-লাল এই তিন নেতার নামানুসারে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই বাল-পাল-লালের যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

আর জাতীয়তাবাদী নেতারা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে কাকুতি-মিনতি না করে লড়াই-এর পথে যেতে চাইছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা এই ব্যাপারে নরমপন্থীদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এঁরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। মহামান্য তিলকের মতো শ্রেষ্ঠ নেতাও মেয়েদের বিবাহের বয়স দশ বৎসরের স্থলে বার বৎসর করাতে বিরোধিতা করেন।

প্রকৃতপক্ষে এই জাতিয়তাবাদীরা জাতিয়তার ভারতীয় ভিত্তি ভূমির অনুসন্ধান করছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষার অভাবে এঁরা পুরানো হিন্দু ধর্ম এবং সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সংস্কৃতিকেই তাঁদের জাতিয়তার ভিত্তি করে নেন। বাল গঙ্গাধর তিলক গো-রক্ষা সমিতি স্থাপন করেন এবং জাতীয় উৎসব পালনের রেওয়াজ চালু করেন। শুধু শিবাজীকে নিয়েই তিনি জাতীয় উৎসব পালনের রেওয়াজ শুরু করেননি, গনেশের সম্মানার্থেও উৎসব শুরু করেন। বাংলাদেশে কালীপূজাকে রাজনীতিরই ভূষণ করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই বন্ধন জাতীয় ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক ছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ধর্মীয় রাজনীতির পুরো সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তাঁদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণের জন্য তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনকে লড়াই-এর হাতিয়ার বানাতে অক্ষম হয়। এঁরা ব্যক্তিগত বীরত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন, ফলে সন্ত্রাসবাদ এঁদের সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই জাতীয়তাবাদী নেতাদের ধর্মীয় উগ্রতা এবং কুসংস্কার প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আঘাত হানে। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ

এদের সঙ্গে হাত মিলাতে পারতেন তারা এদের ধর্মান্ধতার জন্যে বসে পড়েন, আর অনেকে নরমপন্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে চিন্তা-ধারায় এক হলেও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নরমপন্থীদের দলে যোগ দেন। যদিও নরমপন্থীদের সঙ্গে তার রাজনীতির কোন মিল ছিল না।

জাতীয়তাবাদীদের এই ধর্মীয় উগ্রতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" নীতি মদদ পায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের স্বার্থের খাদের দ্বারা মুসলমানদের কংগ্রেস সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করে এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা করে। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন যাতে বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ না করে সেই জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস সংগঠন তৈরী করে। আর আজ সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুসলিম লীগ স্থাপন করল।

এই প্রাচীনপন্থী জাতীয়তাবাদীরা প্রায় অধিকাংশই পরবর্তী সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হন এবং ইংরেজদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে কংগ্রেস ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে যায়। উগ্রপন্থী এবং নরমপন্থীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ মতানুসারে কাজ করতে শুরু করে। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা বর্তমান ছিল। এই বৎসরেই আবার এই দুই পন্থী এক হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে নরমপন্থীরা চিরকালের জন্যে কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং লিবারেল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করে।

৩

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভেদনীতি এবং ভারতীয়দের অধিকার অর্পণের অনিচ্ছা। ইংরেজী শিক্ষিত শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। এক ভাইসরয়ের আমলে হয়তো ভারতীয়দের কিছু অধিকার দেওয়া হল, কিন্তু আর একজন ভাইসরয় এসে সেই অধিকার কেড়ে নিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে আতঙ্ক স্বরূপ হয়ে ওঠে, ফলে ইংরেজী শিক্ষাকে তারা সীমিত করার চেষ্টা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন। লর্ড কার্জনের আমলেই আইন সংশোধন করে মিউনিসিপ্যালিটির গণপ্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়। এবং মিউনিসিপ্যালিটির কর্মভার সরকারী চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেয়া হয়। ভারতীয়রা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু লর্ড কার্জন তাদের প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের প্রভাব পরবর্তী কয়েকটি বছরেও ছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতীয় জনসাধারণের জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তেমন কোন সাহায্য তো করেইনি, বরং ১৯০৩ সালে ১লা জানুয়ারী লর্ড কার্জন অজস্র টাকা ব্যয় করে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে দিল্লীর দরবারে সপ্তম এডওয়ার্ডকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ভারতীয় সংবাদ-পত্র এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের বক্তব্যে কোন আমল দেয়নি।

১৯০৩ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতি লালমোহন ঘোষ দিল্লীর এই দরবারকে রাজনৈতিক তামাশা বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় জনসাধারণের রাজভক্তি কম আছে বলে তারা দিল্লীর এই দরবারের বিরোধিতা করেনি, তারা এই জন্যে বিরোধিতা করে যে, যে সময় দিল্লীর এই দরবার জাঁক-জমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয় সেই সময় অসংখ্য মানুষ দুর্ভিক্ষের জন্য অনাহারে মারা যায় অথচ দিল্লীর এই আড়ম্বরপূর্ণ দরবারের জন্যে যে টাকা ব্যয় হয় তা তাদেরই ঘাড়ে এসে চেপেছে, এটা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঐ সময় সমস্ত ভারতীয় নেতারা যখনই ব্রিটিশ

আমলাতন্ত্রকে আক্রমণ করেছে, তখনই তারা ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি তাঁদের রাজভক্তি জাহির করেছে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব যে সমালোচনা করতেন ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ আমলারা সেই আলোচনাকে রাজদ্রোহ বলে অভিহিত করতেন। ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ আমলাদের ওই বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই নেতৃবৃন্দ যথাসাধ্য প্রমাণ করায় চেষ্টা করেন যে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি তারা যোলা ষোল আনা অনুরক্ত। তাঁরা বললেন ভারতে ব্রিটিশ আমলারা তাদের কাজের দ্বারা ব্রিটিশ সম্রাটেরই বদনাম করছে এবং এই শাসন কর্তারা ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। তাদের এই বিশ্বস্ততা মেকী।

এই নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আসল চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এঁরা জানতেন না যে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসনকর্তা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠী। ভাইসরয় আর ভারতের অন্যান্য ব্রিটিশ শাসন কর্তারাই নয়, স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাটও ছিলেন এই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল।

১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কালা কানুন পাশ করে লর্ড কার্জন শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষ আরো তীব্র করে তুললেন। এই শিক্ষিত সমাজ বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষা লাভ পছন্দ করছে না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয়দের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে তাদের উপর সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শাসন করতে চায়। এই ব্রিটিশ পুঁজিবাদই খোদ ব্রিটেনে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে, অথচ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে সেই ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠীই উপনিবেশগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যে পদক্ষেপ নিলেন তাতে ভারতের রাজনীতির আকাশে তুমুল ঝড় ওঠে। লর্ড কার্জনের এই পদক্ষেপ ছিল বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ বাংলাকে দু টুকরো করা। ঐ সময় বাংলাদেশ ছিল আজকের পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, বিহার এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে। ঐ সময় বাংলাদেশের মোট জন-সংখ্যা ছিল আট কোটি, তার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল তিন কোটি। এই সময় ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। স্বাভাবিক কারণে তাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনা অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশী ছিল। এখানে বড় বড় রাজনীতিবীদ, সমাজ-সংস্কারক এবং বিদ্বানের জন্ম হয়েছিল। এইজন্য বাংলাদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

লর্ড কাজন রাজনৈতিক চেতনা এবং আন্দোলনের এই প্রাণকেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্যে বাংলাদেশকে দুই টুকরো করে দিলেন। পূব বাংলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করে একটি অঞ্চল তৈরী করেন—যার রাজধানী হয় ঢাকা। আর পশ্চিমবাংলা বিহার এবং উড়িষ্যাকে নিয়ে আর একটি প্রদেশ তৈরী করে তার রাজধানী করলেন কলকাতা। প্রশাসন এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর বিকাশের দৃষ্টির কোণ থেকে দেখলে বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা উচিত ছিল—বাংলা ভাষাভাষীদের নিয়ে বাংলা দেশ, হিন্দী ভাষাভাষীদের নিয়ে বিহার এবং ওড়িয়া ভাষাভাষীদের নিয়ে উড়িষ্যা। পরে অবশ্য এই ভাষাভাষী ভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়, কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি লর্ড কাজনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রকে দুর্বল করা।

ভারতীয়রা যখন কাজনের এই উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন, তখনই তারা পুরাদমে এর বিরোধিতা শুরু করে দেন। হাজার হাজার সভা সংগঠিত করে তারা বঙ্গভঙ্গ-এর বিরোধিতা করে আওয়াজ তোলে। ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় বিভাগের সচিবকে তারা অনুরোধ করে, তিনি যেন লর্ড কাজনের এই প্রস্তাবকে না মেনে নেন। ৭০ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত এক পত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়ে লর্ড কাজনের এই অবিবেচক প্রস্তাবকে রদ করার জন্যে আবেদন করা হয়। কিন্তু কেহই কোন কথা শোনে না। ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গ-এর ঘোষণা করা হয়, আর ১৬ই অক্টোবর ঐ ঘোষণাকে কার্যকরী করা হয়। বাংলাদেশকে দুই টুকরো করা হয়। এবং এই দুই অঞ্চলে পৃথক পৃথক লেফটেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কুকর্ম ছাড়াও দুটি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ১৯০৫ সালের এই ব্যাপক আন্দোলনের জমি তৈরী করে দেয়। সেই সময় জারতন্ত্রকে ইউরোপের একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে মনে করা হত। ছোট্ট জাপান এই সময় এশিয়া ভূখণ্ডে নতুন শক্তি নিয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৪-০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জাপান সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়াকে পরাজিত করে। জাপানের মতো ক্ষুদ্র এশিয়ার এই রাষ্ট্র ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়াকে পরাজিত করলে, দুনিয়ার প্রধানতঃ এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির মধ্যে বিশ্বাস এবং উদ্দীপনা দেখা দেয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যেও এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অজেয় নয়। আর এই সময় অর্থাৎ ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সফলতা লাভ করে। এই ঘটনাবলী ভারতবর্ষের জন-

সাধারণের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বঙ্গভঙ্গের আগুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠে।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে সর্বপ্রথম বিদেশী দ্রব্য বয়কটকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করে। বিদেশী দ্রব্য বয়কটের এই আন্দোলনের ঘোষণা ১৯০৫ সালের ৭ই আগাষ্ট করা হয়। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আওয়াজ ওঠে। জাতীয় শিক্ষা এবং স্বরাজের ধ্বনিও তাড়াতাড়ি এসে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এই প্রচণ্ড আলোড়নে গোখেলের মতো নরমপন্থী নেতাও ক্ষেপে ওঠেন। ১৯০৫ সালে বেনারসে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার সভাপতি ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেলে। গোখেলে সভাপতির মঞ্চ থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন এবং একে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সবচেয়ে জঘন্য কাজ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নরমপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেস এগিয়ে যেতে অক্ষম হয়।

উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। উগ্রপন্থীদের চাপে ১৯০৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দাদাভাই নৌরজী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। যদিও দাদাভাই নৌরজীর বয়স তখন ৮১ বৎসর হয়েছিল এবং ইংলণ্ডে বসবাস করছিলেন, তবু নরমপন্থীরা যাতে অধিবেশনের সভাপতিত্ব পদ তিলকের হাতে না যায় সেজন্য দাদাভাই নৌরজীকে ইংলণ্ড থেকে নিয়ে আসেন। দাদাভাই ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকাতে কংগ্রেস ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশী শিক্ষা এবং স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনে গৃহীত এই প্রস্তাব প্রকৃত পক্ষে সরাসরি জাতীয় পুঁজিবাদের কর্মসূচী ছিল। বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারের মুনাফা ভারতের নয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীরাই লাভ করে। অবশ্য স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে এবং সমগ্র দেশের পক্ষে তা ছিল লাভজনক। এর অর্থ জাতীয় পুঁজিবাদ এবং দেশের স্বার্থ ছিল অভিন্ন।

স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না, বরং এই স্বরাজের অর্থ ছিল ঔপনিবেশিক পদ্ধতিতে শাসন এবং আজকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে তা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ।

এই স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ করে বাংলা দেশে অত্যন্ত জোরদার হযে ওঠে। বিদেশী বস্ত্র পুড়াতে লাগে। রেশমী চুড়ি ভেঙ্গে ছুড়ে দিতে শুরু করে। রাজনৈতিক নেতারা ছাড়াও খবরের কাগজ, সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক, কবি, গায়ক এবং নাট্যকাররাও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্যে তাঁদের লেখনী ধরেন।

এ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সবচেযে প্রথম ঝঞ্ঝা। এই আন্দোলন দেশের অন্যান্য প্রান্তেও আলোড়ন তুলে, এর মধ্যে মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাল গঙ্গাধর তিলকের মারাঠী পত্রিকা 'কেশরী' এবং লালা লাজপত রাযের ইংরেজী দৈনিক 'পাঞ্জাবী' শিক্ষিত মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপ পাঞ্জাবেও অসন্তোষের আগুন জ্বালিযে দেয়। ভারতীয কুলিদের বুট দিযে পেটে লাথি মারা ছিল ইংরেজদের কাছে এক সাধারণ ঘটনা। এতে হামেশাই কুলিরা মারা যেত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনার কেউ ছিল না। এক ইংরেজ সাংবাদিক তার চাকরকে গুলি করে। গুলিতে তার চাকর মারা যায। কিন্তু আদালত এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে সেই ইংরেজ সাংবাদিককে মাত্র ছ মাসের কারাদণ্ড দেয। আদালতের রাযে বলা হয এই ইংরেজ জ্ঞানত তাকে গুলি করেনি, হঠাৎই গুলি বের হযে যায। ঠিক এই রকমই এক রাত্রিতে রাওযালপিণ্ডি স্টেশনে এক ভারতীয মহিলা এক গাড়ি থেকে নেমে অন্য গাড়ির জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন একজন ইংরেজ এ্যাসিস্টেন্ট স্টেশন মাষ্টার এই মহিলাকে ভয দেখিযে নিজের কামরায নিযে গিযে তাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালতে যখন মামলা ওঠে, তখন সেই ষ্টেশন মাষ্টারকে বেকসুর খালাস দিযে আদালত বলে যে, এই মহিলার সম্মতিতেই এই ঘটনা ঘটে।

পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে যখন ইংরেজ শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে তখন সরকার সেই অসন্তোষের আগুন আরও জ্বালিযে দেয। এই আগুনে তা ঘৃতের কাজ করে। ১৯০৭ সালে এপ্রিলে 'পাঞ্জাবী' দৈনিকের মালিক জসবন্ত রাও এবং সম্পাদক অঠাবলেকে ছ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয এবং জসবন্তরাওযের ১০০০ টাকা এবং অঠাবলের ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। এই ঘটনায লাহোর প্রতিবাদ মুখর হযে ওঠে। কোন কোন ইংরেজের ওপর আক্রমণও হয়। ফলে গ্রেফতার চলতে থাকে। ৯ই মে লালা লাজপত রায় এবং সর্দার অজিত সিংহকে গ্রেপ্তার করে বার্মায পাঠায় এবং বার্মার মাণ্ডলে দুর্গে বন্দী করে রাখা হয।

দেশের অন্যান্য প্রান্তেও দমন-পীড়ন চলছিল। 'বন্দোমাতরম' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামলা চলছিল, সেই মামলায় বিপিন চন্দ্র পালকে সাক্ষী দেয়ার জন্যে ডাকা হয়। 'বন্দোমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগকে বিপিন চন্দ্র পাল অন্যায় বলে অভিযোগ করে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন। এই জন্যে বিপিন চন্দ্র পালের বিরুদ্ধেও ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় আর একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিপিনচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্যে অক্টোবরের প্রারম্ভে কলকাতায় বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের জনসাধারণের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার জন্যে ভারতবর্ষের নেতাদের বিরোধিতা সত্বেও ১লা নভেম্বর ১৯০৭-এ সেডিসস মিটিংস্ এ্যাক্ট পাশ করে।

এই সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও উগ্রপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। নরমপন্থীদের নেতা ছিলেন স্যার ফিরোজ শাহ মেহেতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী. গোপাল কৃষ্ণ গোখেলে এবং উগ্রপন্থীদের নেতা ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে সুরাটে বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেস ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে যায়। এই দুই দল ১৯১৬ পর্যন্ত পৃথক পৃথক হিসেবে কাজ করে। এই বছরেই এই দুই দল আবার একত্রিত হয় এবং একসঙ্গে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু ১৯১৮ সালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় যখন এসে যায়, তখন মডারেটরা (নরমপন্থী) চিরদিনের জন্যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে লিবারেল ফেডারেশন গঠিত করে।

এই সময়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লববাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বিপ্লব-বাদীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০৭, অক্টোবরে মেদিনীপুরের (বাংলাদেশ) কাছে ভাইসরয়ের গাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়। রেলের নীচে বোম ফাটে এবং ভাইসরয়ের গাড়ি রেল লাইন থেকে নেমে যায়। ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার কাছে এক রেল ষ্টেশনে ভূতপূর্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। গুলি এলেনের পিঠে লাগে কিন্তু তিনি বেঁচে যান। ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮-এ প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বোস কলকাতার ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্যে মজফরপুরে তার গাড়ির ওপর বোম নিক্ষেপ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিংসফোর্ডের বদলে সেই গাড়িতে দুই জন ইংরেজ মহিলা ছিলেন। তারা দুই জনেই আহত হয়। পুলিশ প্রফুল্ল

চাকীকে মোকামা ষ্টেশনে ঘিরে ফেলে। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে প্রফুল্ল চাকী নিজেই নিজেকে গুলি করেন। সতের বৎসর বয়স্ক ক্ষুদিরাম বোসকে পুলিশ অন্যস্থানে গ্রেপ্তার করে। ১১ মে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সঙ্গে জড়িত পুলিশের সাব ইনেস্পেক্টারকে ঐ বছরের নভেম্বরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এইসব ঘটনা বাড়তে দেখে সরকার ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা চালায়। যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নরেন্দ্র গোসাই রাজসাক্ষী হয়ে যায় এবং জেলখানার মধ্যেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকার পক্ষ থেকে এই মামলার পরিচালক সরকারী উকিল এবং পুলিশের ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্টকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।

মহারাষ্ট্রেও প্রচণ্ডভাবে দমন-পীড়ন চালান হয়। ১৯০৮ সালের প্রারম্ভে বোম্বাই-এ চারটি স্থানীয় ভাষার পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা আনা হয়। দৈনিক মারাঠী 'কাল'-এর সম্পাদক পরাণজপেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ২৪শে জুন, ১৯০৮এ লোকমান্য তিলককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 'কেশরী'-তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। লোকমান্য তিলককে ছয় বৎসরের জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয় এবং বার্মার মাণ্ডলে দুর্গে তাকে বন্দী করে রাখে। তিলকের এই সাজার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকরা এক জোরু হরতাল করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই হরতাল হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর সবপ্রথম রাজনৈতিক হরতাল। এই দিন বোম্বাইতে পুলিসের গুলিতে ১৫ জন নিহত হয় এবং ২৮ জন আহত হয়।

ভারতীয় জনগণের এই সব লড়াই এবং বিশেষ করে বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণীর হরতাল দেখে লেনিন ভারতীয় জনগণের এই জাগরণকে অভিনন্দন জানান। এই লড়াইকে তিনি বিপ্লবী লড়াই বলে অভিহিত করেন এবং ভবিষ্যত-বাণী করেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন আর বেশী দিন টিকবে না। লেনিনের এই ভবিষ্যতবাণী করার চল্লিশ বৎসরে মধ্যে ভারতবর্ষে দু'শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

সমগ্র দেশ জুড়ে যখন আন্দোলনের ঝড় বয়ে চলেছিল, তখন ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল পলিসির চাল চালেন। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রথম মুসলমানদের উসকিয়ে দেয়। তাদের ইশারায় আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের এক প্রতিনিধি মণ্ডলী ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং মুসলমানদের

জন্যে ভোটের বিশেষ অধিকার প্রার্থনা করে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬, ৩০শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়।

এই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীই একদিন বিপ্লবী আন্দোলনকে ঠেকানোর জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কৃষক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কংগ্রেসের জন্ম দিয়ে ছিল। আর এবার তারা এইজন্যে মুসলিম লীগকে জন্ম দিল যে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বীজ সৃষ্টি করে বিপ্লবী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে যাতে দুর্বল করা যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ তার সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতার চরিত্র দেখিয়ে দেয়। লীগ বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করে এবং ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের বিরোধিতা করে।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর করার জন্যে ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী আরও এক পা অগ্রসর হয়। মালে-মিণ্টো সংস্কার আইন মুসলমান, ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকে বিধান পরিষদে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিবৃন্দ পৃথকভাবে পাঠানের অধিকার দেয়। এ একদিকে যেমন ছিল মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া, তেমনি অন্যদিকে ছিল ভূস্বামী সামন্তপ্রভু এবং বড় পুঁজিপতিগোষ্ঠীদের নিজের পক্ষে এনে বিপ্লবী আন্দোলনের বিরোধিতার এক প্রচেষ্টা।

দমন-পীড়ন পুরাদমেই চলছিল। ১৮৭৮ সালের প্রেস এ্যাক্টকে লর্ড রিপন তার রাজত্বকালে বাতিল করে দেন। ১৯১০ সালে এক নতুন এবং কঠোর প্রেস এ্যাক্ট আবার চালু করা হয়। ১৯০৭ সালে সেডিসস মিটিংস এ্যাক্ট বাক্‌স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, আর ১৯০১ সালের নতুন প্রেস এ্যাক্ট লেখার স্বাধীনতা হরণ করে নেয়।

কিন্তু এই দমন এবং চাল সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে পিছু হঠতে হয়। ১৯১০ সালে ব্রিটিশ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয় এবং পঞ্চম জর্জ সম্রাট হন। পঞ্চম জর্জ খুব জাঁকজমের সঙ্গে ভারতে আসেন এবং ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বরে দিল্লীতে বিরাট আকারে দরবার করেন। এই দরবারে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করেন। এ ছিল এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বিজয়।

৪

প্রথম মহাযুদ্ধ এবং জাতীয় আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮) ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে দুনিয়াকে আবার ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্যে যুদ্ধ। নতুন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ পুরানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশ এবং ফ্রান্সকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

এই যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে আরও লুণ্ঠন করে। এই সময় তারা এই দেশ থেকে খাদ্য এবং যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামও বোঝাই করে নিয়ে যায়। তাছাড়া তারা সাড়ে চৌদ্দ কোটি পাউণ্ড ভেট নেয় এবং সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ড সিকিউরিটি বণ্ড ভারতকে কিনতে বাধ্য করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্যে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে এই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাঠায়। এই বাহিনী পোষার জন্যে সমস্ত ব্যয়ভার ভারতীয় জনগণের উপরই এসে পড়ে। এই যুদ্ধ ভারত এবং অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের জন ও অর্থবলকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে এবং সমস্ত দেনা ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন ব্যাপক জনসাধারণের জীবনমান ভেঙ্গে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর—যারা দেশের অভ্যন্তরে কলকারখানা স্থাপন করেছিল তারা মুনাফা লুণ্ঠন করে।

ব্রিটিশ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ছাড়াও দেশীয় পুঁজিপতিগোষ্ঠীর এক অংশ বিশেষভাবে লাভবান হয়। তারা এই সুযোগে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করে এবং উৎপাদন বাড়িয়ে মুনাফা লুঠারও সুযোগ পায়। এই যুদ্ধের সময়েই টাটা তার লৌহ কারখানা স্থাপন করে। কিন্তু অন্যদিকে হস্ত শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। তাদের মজুরীও কিছু বাড়ে, কিন্তু সেই তুলনায় জিনিস-পত্রের দাম অনেক বেড়ে যায়। শ্রমিক এবং কৃষকের অবস্থার অবনতির জন্যে জনসাধারণের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করে এবং আরও অধিকার যারা চাইছিল দেশের সেই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধও তীব্র হয়ে

ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর এই বিরোধই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রবল সংগ্রামের জন্ম দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র বিশ্লেষণ করে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে তাদের সঙ্গীন নিজ নিজ দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে ঘুরিয়ে দিতে এবং তাদের শাসন ক্ষমতাকে উলটিয়ে দিতে আহ্বান জানান। উনি পরাধীন দেশের জনতাকে তার নিজের দেশে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্যে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ থেকে হটিয়ে দিতে আহ্বান জানান।

কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ সম্পর্কে জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের মনোভাব কি ছিল? জাতীয় আন্দোলনের এই নেতাদের মনোভাব স্বাধীনতার সেনানীর মতো ছিল না। তাদের মনোভাব ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বস্ত তল্পীবাহক আর তারা ছিল গোলামের মতো। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয় সেই সময় কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি মণ্ডলী লণ্ডনে ছিলেন—যে প্রতিনিধি মণ্ডলীর মধ্যে লালা লাজপত রায়, জিন্না প্রভৃতি ছিলেন।

এঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক পত্রে তাদের আশ্বাস দিয়ে লেখেন যে সমস্ত ভারতবাসী তাদের মন প্রাণ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করবে। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সমগ্র দেশকে সমর্পণ করেন।

শুধু নরমপন্থী নেতা দাদাভাই নৌরজী, স্যার ফিরোজ শাহ মেহেতা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যই নন, উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা তিলকও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মদদ করার জন্য কর্তব্য নির্দেশ করেন। ১৯১৪ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর তিলক 'মারাঠা' নামক পত্রিকায় লেখেন, "···এই জন্যে আমার দৃঢ় বক্তব্য, এই অবসরে কি ধনী কি গরীব, কি ছোট কি বড় প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য মাননীয় সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করা।"

তিলকের চেয়েও গান্ধীজীর ভূমিকা ছিল আরও লজ্জাজনক। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে চলে আসেন। *এই সময় গান্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরম ভক্ত ছিলেন এবং প্রতিদিন ব্রিটিশ সম্রাটের দীর্ঘজীবন কামনা করে মন্ত্র পাঠ করতেন, 'লং লিভ দ্য কিং, গড সেভ দ্য কিং'।* যে সব ভারতীয় তরুণরা তাঁকে স্বাগত জানাতে আসে, লণ্ডনে পৌঁছেই উনি তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিজয়ের জন্য কাজ করতে পরামর্শ দেন। আর স্বয়ং এক পত্র মারফত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে নিজের সেবাকে কাজে লাগানোর জন্যে সমর্পণ করেন। ভারতবর্ষে ফিরে এসে উনি ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদকে সমস্ত রকম মদদ দিতে লাগলেন। ইনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় তরুণদের ভর্তি হওয়ার জন্যে এবং কৃষকদের উপদেশ দিলেন: সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে দেশের স্বরাজ নিয়ে এস। আমাদের দেশের কিছু বোদ্ধা লোক এই গান্ধীকেই লেনিনের সমতুল্য এবং মহান দেখানের চেষ্টা করেন: এই সব লোকেরা যদি প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন এই দুই নেতার নিজ নিজ দেশে তাদের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন, তবে তারা এ কথা বলতে সম্ভবত সাহসী হতেন না।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমস্ত রকম ভাবে মদদ দেয়। মদদ দেয় বলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী তাদের আশীর্বাদে ধন্য করে। যুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের প্রায় প্রতিটি অধিবেশনে কোন না কোন ইংরেজ গভনর উপস্থিত হতেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতাদের আশীর্বাদ দিতেন। এই যুদ্ধের সময়েই তারা ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের কিছু কিছু সুবিধা দান করে। ১৯১৫ সালে বিদেশ থেকে ভারতে আমদানীকৃত জিনিসপত্রের উপর শতকরা ৫ টাকা শুল্ক বসান হয়। এবং পরবর্তী বছরে আরও কিছু দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষ করে আমদানীকৃত স্বুতী বস্ত্রের উপর শুল্ক আরও বৃদ্ধি করা হয়। বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে স্তুতী বস্ত্রের মালিকগোষ্ঠী এতে নিঃসন্দেহে লাভবান হয়। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী-গোষ্ঠীকে সমর্থন করায় কিছু বৃহৎ শিল্পের মালিক ভারতীয় পুঁজিপতিগোষ্ঠী কিছুটা লাভবান হলেও ভারতীয় আপামর জনসাধারণের পক্ষে তা ছিল অভিশাপ স্বরূপ।

এই যুদ্ধের সময় দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ১৯১৬ সালে নরমপন্থী এবং জাতীয়তাবাদীরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বন্ধুত্ব। ইতিহাসে এই ঘটনা লখনৌ প্যাক্ট নামে প্রসিদ্ধ। কংগ্রেস এবং লীগ যৌথভাবে ভারতবর্ষের রাজনীতির সংশোধন এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্যে এক কর্মসূচী উপস্থিত করে। এই কর্মসূচী কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কর্মসূচী হিসেবে পরিচিত। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৬ সালে তিলকও ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন সংঘ (হোম রুল ফর ইণ্ডিয়া লীগ) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী এবং ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল তারই প্রতীক।

কিন্তু এই সব ঘটনা থেকেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ব্রিটিশ শাসক-

গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সংগঠিত করার প্রচেষ্টা। এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে গদর পার্টির ভূমিকা ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় যে সব ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের তারা ১৯১৩ সালের ১০ই মে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী এবং গুজরাটি ভাষায় 'গদর' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করে সেখানকার ভারতীয় অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। এই পত্রিকা ভারতীয় জনগণকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্যে প্রেরণা জোগাতে শুরু করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই এঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সঠিক সময় মনে করেন। সেজন্যে আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক ভারতীয় নাগরিক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং অনেক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসারও চেষ্টা করে। রাউলট কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যুদ্ধের সময় ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্যে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা তিন জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে আনার চেষ্টা করে।

'কোমাগাটা মারু'-র ঘটনা এই সময় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরুদিত সিংহের নেতৃত্বে এক বিরাট ভারতীয় দল জাপান থেকে 'কোমাগাটা মারু' নামক এক জাহাজ ভাড়া করে ভারতের দিকে রওনা হয়। এদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের। শাসকগোষ্ঠী জার্মানদের ষড়যন্ত্র ভেবে তারা যেন রাস্তায় কোথায় নামতে না পারে তার হুকুম দেয়। জাহাজ এসে বজবজ পৌঁছায়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের রেলগাড়ী করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য হুকুম দেয়। এরা যাতে কলকাতা বা আশে পাশে অন্য কোনখানে নামতে না পারে সে জন্যেও সতর্ক থাকতে বলা হয়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই আচরণে 'কোমাগাটা মারু' জাহাজের যাত্রীরা খুব ক্ষুব্ধ হয় এবং রেলগাড়ীতে উঠতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। এই গুলি বর্ষণে আটজন শিখ নিহত হয়। সর্দার গুরুদিত সিংহ এবং আরও অনেক যাত্রী পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

১৯১৪ সাল শেষ হতে না হতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে হাজার হাজার ভারতীয়রা পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেন, এদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ ছিলেন। এরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্যে সংগঠন গড়ে তুলতে লাগেন। পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তোলার জন্যে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে

রাসবিহারী বোস, শচীন্দ্রনাথ সন্যাল, কর্তার সিংহ এবং জগৎ সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সংগঠিত করার জাল পাঞ্জাব থেকে সিঙ্গাপুর অবধি বিস্তারলাভ করে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী একসঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতে অভ্যুত্থানের দিন নির্ধারিত হয়ে যায়। ঠিক একই সময় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মকে বিদ্রোহীরা নিজেদের হাতের মুঠোয় আনার পরিকল্পনা ছকে ফেলে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে অনেকে ধরা পড়ে এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে তিনটি বড় মামলা এদের বিরুদ্ধে চালন হয়। প্রথম মামলা ৬১ জনের উপর চলে। এই মামলার আসামীদের মধ্যে ছিলেন পৃথ্বী সিংহ, পণ্ডিত পরমানন্দ (ঝাঁসী), কর্তার সিংহ, ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক গণেশ পিঙ্গলে, জগৎ সিংহ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ২৪ জনের ফাঁসী এবং বাদ বাকী সবার দ্বীপান্তর হয়ে যায়। কর্তার সিংহ এবং তাঁর সঙ্গীরা 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মামলাতেও অনেকের মৃত্যুদণ্ড এবং দীপান্তর হয়ে যায়। এই দমন-পীড়নের জন্যেই উত্তর ভারতের বিদ্রোহ আর সম্ভব হয়নি।

কিন্তু এই ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয়। অল্পক্ষণের জন্যে সমস্ত ব্যারাক বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী রুশ এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর সহযোগিতায় এই বিদ্রোহকে দমন করে। অনেক সৈনিক এখানেও শহীদ হন।

এই মহাযুদ্ধের সময় কাবুলে স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অস্থায়ী সরকারের কর্ণধার ছিলেন লালা হরদয়াল, বরকতুল্লা, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতি। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন এঁদের প্রতি ছিল। এঁরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করে ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন। কিন্তু এঁরা জানতেন না এদেশের কোটি কোটি খেটে খাওয়া মানুষের সংগঠন তৈরী করেই এই সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে। অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয়ের পর এঁদের সেই স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়।

৫

আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ

জাতীয় অন্দোলনের নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবা করে এই আশা পোষণ করছিল যে যুদ্ধ শেষে তাদের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহনের সামান্য কিছু অধিকার দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এঁরা সাম্রাজ্যবাদেব চরিত্র উপলব্ধি করতে প্রচণ্ডভাবে ভুল কবেন। তা ছাড়াও আবও একটি কথা ছিল। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ছিলেন ভারতের নবজাত পুঁজিপতিগোষ্ঠি এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি। যাব জন্যে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লডাই করতে সাহসী ছিলেন না। তাঁরা তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাঁদের মধ্যে যে বিরোধ বতমান ছিল সেই বিরোধেব মীমাংসার পথ খুঁজে ছিলেন তাদের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা দেখিয়ে। যুদ্ধের সময় গান্ধীতো সাম্রাজ্যবাদের সেনাবাহিনীতে ভারতীয় কৃষকদের ভর্তি করেন এবং বলেন ফৌজে ভর্তি হয়ে স্ববাজ নিয়ে এস।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা দুনিয়ার পরাধীন দেশগুলিকে প্রচণ্ড শক্তি এনে দেয়। সারা দুনিয়াতে বিপ্লবের যে উত্তাল তবঙ্গ আসে সেই উত্তাল তরঙ্গ ভারতবর্ষকে নাড়া দেয়।

ধূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে সক্ষম হয় যে ভারতের উপরও এই বিপ্লবের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাই তারা নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্যে আগে থেকেই পদক্ষেপ বাড়ায়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (মার্চ ১৯১৭) পর পাঁচ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য ঘোষণা করে বলে, "স্বায়ত্ত শাসন-সংস্থাগুলিকে ক্রমান্বয়ে বিকাশ সাধন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারত যাতে ধীরে ধীরে নিভরযোগ্য সরকার পায়।"

এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১৯ সালের শেষের দিকে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সংশোধনী বিল পাশ হয় এবং ১৯২০-এর দিকে এই সংশোধনী বিলকে কার্যকরী করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানায় এবং ১৯১৭ সালে কলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করে যে যতই অসুবিধা হোক না কেন তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে একাত্ম থাকবে। এ ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার দেউলেপণার প্রমাণ।

এই নেতৃবৃন্দ তাঁদের সেবার বিনিময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠীর কাছ থেকে বিরাট পুরস্কার পাওয়ার আশা করেছিল, কিন্তু বিনিময়ে তাঁরা কি পেয়েছিল? সবচেয়ে প্রথম রাওলট এ্যাক্ট (মার্চ ১৯১৯) দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে মামলা-মোকদ্দমা না চালিয়েও তাকে নজরবন্দী রাখার আইনগত অধিকার ব্রিটিশ অমলাতান্ত্রীরা লাভ করে। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তৈরী প্রথম পদক্ষেপ। এর পরেই সংগঠিত হয় জালিয়ানওয়ানালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৬ই এপ্রিল, ১৯১৯)। এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রমাণ করে তারা জাতীয় আন্দোলন দমন করতে কত নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হতে পারে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের সংস্কার শুধু দেশের জনসাধারণেরই নয় কংগ্রেস নেতৃত্বেরও সামান্যতম আশাও পুরণ করেনি। এর জন্যে এই নেতৃবৃন্দ খুব দুঃখিত হন। এই আঘাতে তাদের কিছুটা চেতনার উদয় হয়, কিন্তু পরোপুরি উদয় হয় না। এর পর থেকে তাঁরা ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা ভাবতে লাগলেন। ফলে নরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে লিবারেল ফেডারেশন স্থাপন করেন।

যখন কংগ্রেস নেতৃবর্গ বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পা চাটছিলেন সেই সময় ভারতবর্ষের শ্রমিক কৃষক এবং আপামর জনসাধরণ কি করছিল? শ্রমিক কৃষক এবং আপামর জনতা লড়াই-এর ময়দানে নেমে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবিল শুরু করে। যুদ্ধ চলাকালীন সময় সমান্যতম যে কলকারখানার প্রসার ঘটে তার ফলে ভারতবর্ষের শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, সেই শ্রমিকশ্রেণীই প্রথম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯১৮ সালের প্রারম্ভেই এই শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। তারা মজুরী বৃদ্ধি এবং তা ঠিক সময় পাওয়ার জন্যে, টিফনের সময় দেওয়ার জন্যে, জরিমানা কম করা, সাদা এবং কালো শ্রমিকের পার্থক্য বন্ধ করার জন্যে, সাদা অফিসারদের দুর্ব্যবহার বন্ধ করা প্রভৃতির জন্যে আওয়াজ তোলে।

আহমেদাবাদ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের এবং কলকাতার চটকলের শ্রমিকরা একে একে লড়াই শুরু করে। ১৯১৯ সালে, সারা বছর ধরেই প্রায় হরতাল চলে। ১৯১৯ এর মার্চ-এপ্রিলে শ্রমিকশ্রেণী রাওলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে হরতাল করে তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিশেষ পরিচয় দেয়।

১৯১৯-এর শেষার্দ্ধে এবং ১৯২০ এর প্রারম্ভে সমগ্র দেশে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই আরও বৃদ্ধি পায়। কানপুরের ১৭,০০০ কারখানা-শ্রমিক, জামালপুরের ১৬,০০০ রেল শ্রমিক, কলকাতার ৩৫,০০০ চটকল শ্রমিক, বোম্বাই-এর বিভিন্ন কলকারখানার ২,০০,০০০ শ্রমিক, শোলাপুরের ১৬,০০০ কাপড়ের কলের শ্রমিক, ২০,০০০ ডক শ্রমিক, টাটা লোহা-ইস্পাত কারখানার ৪০,০০০ শ্রমিক, মাদ্রাজের ১৭,০০০ এবং আহমেদাবাদের ২৫,০০০ কাপড়ের কলের শ্রমিক ধর্মঘটে নামে। এই সব ধর্মঘটের পৃষ্ঠভূমিতেই ১৯২০ সালের শেষ দিকে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম হয়। এই ১৯২০ সালের কাছাকাছি ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় ১৯২০ সালে তাসখন্দে এবং ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে)।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—যাকে সংক্ষেপে কংগ্রেস বলা হয় সেই কংগ্রেস আর ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনের উদ্দেশ্য ও শ্লোগানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ এবং সক্রিয় সহযোগিতায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মহান নেতা লেনিনের শুভেচ্ছা এবং সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা বিপ্লবকে সংগঠিত করার জন্যে। কংগ্রেসের জন্মের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস অক্টাভিয়েন হিউম। আর ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বাধীনতাকামী ভারতের বিপ্লবীরা। কংগ্রেসের জন্মের সময় আওয়াজ ছিল—মহারাণী ভিক্টোরিয়া কি জয়, আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের সময় আওয়াজ ছিল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। কংগ্রেসের জন্মের সময় যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে যারা এসেছিলেন তারা নিজেদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুতার ফিতে খোলারও অযোগ্য বলে ঘোষণা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে প্রতিশ্রুত বদ্ধ হন। আর কমিউনিস্ট পার্টির জন্মক্ষণে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাত এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন।

মার্চ, ১৯১৯-এ রাওলাট এ্যাক্ট চালু হওয়ার পর জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ খুবই দুঃখিত হন। এঁরা ভেবেছিলেন শাসন ব্যবস্থায় এঁদের অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু তার বাদলে এঁরা পেলেন দমন এবং লাঠি। গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস থেকে ৩০শে মার্চ এই আইনের বিরুদ্ধে হরতাল পালনের

আহ্বান দেওয়া হয়। পরে এই তারিখ পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হয়। কিন্তু এই হরতাল দুই দিনেই হয়। আর এই হরতাল এত সাফল্যমণ্ডিত হয় যে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী এবং খোদ কংগ্রেস নেতারা কেউই এমন আশা করেনি। এই হরতাল সংগঠিত করে ভারতবর্ষের জনগণ প্রমাণ করে যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে তারা যে কোন বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত এবং সঠিক নেতৃত্বের জন্যে উন্মুখ। দুঃখের বিষয় যে সঠিক নেতৃত্ব এগিয়ে আসে না।

কংগ্রেস এবং খিলাফত কমিটির একতা জাতীয় আন্দোলনের শক্তিকে আরও বহুলাংশে দৃঢ় করে। হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর যে নীতি, সে নীতি ব্যর্থ হয়। একই মঞ্চ থেকে ভারত মাতা কি জয় এবং আল্লাহো আকবর ধ্বনি আকাশ কাঁপিয়ে তোলে।

রাওলাট এ্যাক্ট বিরোধের 'অপরাধের' জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জালিয়ান-ওয়ানালাবাগে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের এই পার্কে ডাঃ কিচলু এবং সত্যপালের নির্বাসনের প্রতিবাদে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। এই পার্কে আসা-যাওয়ার জন্যে মাত্র একটিই পথ ছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর হুকুমে জেনরাল ডায়ার প্রায় বিশ হাজার লোকের এই সমাবেশের এই একটি মাত্র বেরুবার পথ বন্ধ করে দিয়ে মেশিনগান এবং বন্দুক চালায়। যতক্ষণ পর্যন্ত গুলি শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ডায়ারের সেনাবাহিনী গুলি বর্ষণ করে চলে। স্বয়ং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিয়োজিত হণ্টার কমিটির রিপোর্ট অনুসারে জানা যায় এই গুলি বর্ষণে প্রায় ৩৭৯ জন মারা যায় এবং আহত হয় প্রায় হাজারের উপর।

জালিয়ানওয়ানালাবাগের এই হত্যাকাণ্ডে সারা পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন জায়গায় টেলিগ্রাফের তার এবং রেল লাইন তুলে ফেলে, রেল স্টেশন এবং সরকারী ভবনগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, জেলের ফটক ভেঙ্গে ফেলে, ব্যাঙ্কের উপর আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এই বিদ্রোহকে সামরিক শক্তি দ্বারা দমন করে। এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত এগার বৎসর তের বৎসরের কিশোরদেরও কালাপানীর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার চালায়।

এই সময়েই আহমেদাবাদে শ্রমিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়। ১১-১২ই এপ্রিল এই দুই দিন আহমেদাবাদের শ্রমিকরা শহরের উপর নিজেদের দখল রাখে। ১২-১৩ই এপ্রিল রাত্রে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এই শহরের মধ্যে ঢুকতে সমর্থ হয়। হণ্টার কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় শ্রমিকশ্রেণী তাঁর

ত্যাগ এবং আত্মবলিদানের এই অমর কাহিনী রচনা করতে ২৫ জনকে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় এবং প্রায় ১২৫ জনের মতো আহত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে প্রত্যেকেই অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু সবচেয়ে আফশোষের কথা গান্ধীজী এর বদলে শ্রমিকদেরই নিন্দা করেন।

আহমেদাবাদের এই ঘটনার প্রতিফলন গুজরাটের অন্যান্য শহরেও পড়ে। বীরমগাঁও-এর ধর্মঘটী জনতা রেল ষ্টেশন এবং থানা জ্বালিয়ে দেয় এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়। সেনাবাহিনী-ভর্ত্তি আহমেদাবাদগামী এক রেলগাড়িকে নদিযাদ নামক জায়গায় লাইনচ্যুত করা হয়।

বোম্বাই-এ পাঞ্জাবের ঘটনার খবর পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং জনতার মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজী এই সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭ই এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনতে সমর্থ হয়। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত ছোটখাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকে।

উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও অশান্তি দেখা দেয়। বিদেশী শাসকগোষ্ঠী অস্ত্র প্রযোগ করেই এই অশান্তিকে দমন করে।

যখন ভারতীয় জনতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আরও উন্মুখ হযে উঠে এবং যে আন্দোলন দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বলে, এই আন্দোলন ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছে। কংগ্রেসের নেতা স্বয়ং গান্ধীজী এই সময দোদুল্যমানতা দেখান। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর হিংসার মোকাবিলা করার জন্যে পাঞ্জাব, আহমেদাবাদ, বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে তথাকথিত কিছু হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে। গান্ধীজী এই হিংসাত্মক ঘটনার শুধু নিন্দা করেই সন্তুষ্ট হননি, তিনি ঘোষণা করেন এই পরিস্থিতিতে কোন রকম আন্দোলন করা হবে না। উনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে কর্মসূচী দিযেছিলেন তা বন্ধ করে দেন।

কিন্তু পুঁজিপতি এবং সামন্তশ্রেণীর এই নেতা ভারতীয় জনগণের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হন না। ১৯২০-২২ পর্যন্ত এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়। অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী আগুনে পেট্রোলের কাজ করে। শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট উচ্চ পর্যায়ে ওঠে। কৃষকদের আন্দোলন মালবারে মোপলা বিদ্রোহ, পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলন এবং পূব উত্তর প্রদেশে সোজাসুজি' সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রূপ

পরিগ্রহ করে। এই পরিস্থিতিতেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এবং কংগ্রেসকে গণসংগঠনের রূপ নিতে বাধ্য করে।

সেপ্টেম্বর, ১৯২০-এ কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় তাঁর ভাষণে স্বীকার করেন যে, "আমরা এক বিপ্লবী যুগের মধ্য দিয়ে চলেছি।" কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, জাতীয় আন্দোলনের এই সব নেতৃবৃন্দ নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের জন্যে বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ভয় পান। ওদের ভয় ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিক এবং কৃষকদের হাতে চলে না যায়। এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির জন্যেই ওরা অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের রাস্তাকেই সবচাইতে সুরক্ষিত মনে করেন।

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে নেয়। এ ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অসহযোগিতার কর্মসূচী। স্কুল-কলেজ, বিধানসভা এবং সরকারী চাকুরী বয়কট, সরকারী পদবী প্রত্যাখ্যান, সাহেবী পোশাক না পরা, চরকা কাটা, খদ্দরের কাপড় তৈরীর আদেশ জারি করে ওরা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের খাজনাবন্ধকে তারা সর্বশেষ হাতিয়ার হিসাবে ঠিক করেন।

এই কার্যক্রমের উপর দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায় এই সবই ছিল মধ্যশ্রেণীর আন্দোলনের কার্যক্রম। শ্রমিক এবং কৃষকদের কেবল মাত্র চরকা কাটতে এবং খদ্দরের কাপড বানাতে বলা হয়। আর কৃষকদের সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে নামার কর্মসূচী সর্বশেষে স্থান দেওয়া হয়।

দেশের জনসাধারণ তবুও তাদের এই কর্মসূচীকে স্বাগত জানায়। নভেম্বরের নির্বাচন বয়কট খুব সফলতার সঙ্গেই পালিত হয়। স্কুল-কলেজের বয়কটও বেশ কিছুটা সফল হয়। মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাঁরা বড় বড় আইনজীবী ছিলেন তাঁরা এই জীবিকা ছেড়ে দেন। অবশ্য এই কাজ করার মতো লোকের সংখ্যা কম ছিল।

ডিসেম্বর, ১৯২০-এ নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমকে আরও ব্যাপকতা লাভ করার কর্মসূচী রচনা করা হয়। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের মধ্যেই পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমে এঁরা আইনগত পন্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকেই স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার চেষ্টা করেন। এখন এঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ পেতে চাইলেন। কিন্তু স্বরাজের অর্থ কি তা তাঁরা স্পষ্ট করে ব্যক্ত

করলেন না। ভাষা ভিত্তিক রাজ্যগুলির পুনর্গঠন প্রস্তাব তাঁরা পাস করলেন। কংগ্রেসকে সারা দেশব্যাপী গণ সংগঠনে পরিণত করার জন্যে তাঁরা গ্রাম শহর মহল্লা-মহল্লায় কংগ্রেস কমিটি খোলার কথা ভাবলেন। আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে দেড়লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার কথা ঘোষণা করলেন। যে কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত কিছু আইনজীবীর সংস্থা ছিল, সেই কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের মধ্যে, বিশেস করে কৃষক জনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

কংগ্রেস সংগঠনের এই পরিবর্তনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হোতা ছিলেন গান্ধীজী। স্বয়ং গান্ধীজী কৃষক জনতার বেশ পরিধান করলেন—তিনি হাঁটু অবধি ধুতি এবং একটি চাদর নিলেন। দেশবাসী আদর করে তাঁকে মহাত্মা গান্ধী বলে অভিহিত করেন। ইনি দেশের সবচাইতে প্রিয় নেতা হলেন এবং আজ পর্যন্ত তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতা হয়নি। এই সময় সমগ্র দেশে আন্দোলনের জোয়ার এসে যায়। এই জোয়ার দেখে গান্ধীজী ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ অবশ্যই এসে যাবে। উনি ১৯২১-এর সেপ্টেম্বরে এমন কথাও বলেন যে, আমি স্বরাজ না এনে ৩১শে ডিসেম্বরের পর নিজের বেঁচে থাকাও কল্পনা করতে পরেছি না।

গান্ধীজী এত বড একটা কথা বলা সত্ত্বেও স্বরাজের জন্যে নিজে কোন কর্মসূচী পেশ করলেন না। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারাও তাঁদের আসন্ন কার্যক্রম কি হবে তা জানতেন না। জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের রচনায় একথা স্বীকার করেছেন।

১৯১৯-এর শেষের দিকে জাতীয় অন্দোলন এক উচ্চ পর্যায়ে পৌছে যায়। ভারতীয় জনতা অসংখ্য মোর্চা সংগঠিত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শ্রমিকরা বড় বড় ধর্মঘট সংগঠিত করে। কৃষক জনতা পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলনে নামে, মালাবারে মোপলা বিদ্রোহে নামে, উত্তর প্রদেশে জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। অন্যান্য রাজ্যেও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নাভিশ্বাস ওঠে। তরুণ ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হয়। শহরে বিদেশী বস্ত্রের বড় বড় অগ্নিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। পিকেটিং এবং ধর্মঘটে বাজার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

জাতীয় আন্দোলনের এই প্রচণ্ড রূপ দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ঘাবড়িয়ে যায়। ওরা অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্যে ব্রিটেনের রাজকুমার-প্রিন্স অব ওয়েলসকে ভারতে আনে। এরা জানত ভারতের জনগণ রাজাকে খুব ভক্তি

করে। এই জন্য প্রিন্স অব ওয়েলসকে দেখে 'স্বামীভক্তির' মত গদগদ হয়ে তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা ছেড়ে দেবে।

কিন্তু ফল বিপরীত হয়। ১৭ই নভেম্বর, ১৯২১-এ প্রিন্স অব ওয়েলস যে মুহূর্তে বোম্বাই-এ পদার্পণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের শহরের বড় বড় রাস্তা থেকে হটানের জন্যে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হয়। বোম্বাই-এর সাধারণ মানুষ পাঁচদিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে। সরকারী এক তথ্য থেকে জানা যায় এই সংঘর্ষে ৫৩ জন প্রাণ দেয় এবং ২০০ জনেরও বেশী গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু জনসাধারণের এই সংগঠিত মোর্চাকে গান্ধীজী ভাল চোখে দেখেননি। পুঁজিপতি শ্রেণীর এই সুচতুর নেতা বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপক জনসাধারণের এই সংগঠিত মোর্চা ভবিষ্যতে পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এই জন্যে বোম্বাই-এর ঘটনা সম্পর্কে উনি লিখলেন: "গত দুদিনের স্বরাজ আমি দেখেছি, এর দুর্গন্ধে আমার নাক ফেটে গিয়েছে।"

গণ আন্দোলনের প্রসার না ঘটিয়ে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে সীমিত রাখার জন্যে কদম বাড়ায়। আর অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের দমন যন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে। প্রথমে তারা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর আক্রমণ করে এবং এই সংগঠনকে বেআইনী ঘোষিত করে। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল সমগ্র আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গ্রেপ্তার করে জেলে আটক করে, কিন্তু ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকরা এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তাদের নাম লিখিয়ে ঘাটতিটুকু পূরণ করে দেয়।

দমন-পীড়নের যন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা হয়। ১৯২১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে গান্ধীজীকে ছাড়া কংগ্রেসের নামকরা সমস্ত নেতাকে জেলে বন্দী করা হয়। জেলে বন্দী রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ২০ হাজার পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ১৯২২ সালের শুরুতে এই বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনের তুফান দেখে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মাধ্যমে তারা আলোচনা চালায়, কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৯২১-এর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেই খুব উৎসাহের সঙ্গে স্থির হয় যে, অহিংসা

অসহযোগ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং এই আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের হাল ভারতের জনসাধারণের হাতে না আসবে। এঁরা আঠারো বৎসরের উর্দ্ধে সমস্ত ভারতীয় জনগণকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে সামিল হওয়ার জন্যে আবেদন করেন। গান্ধীজী কংগ্রেসের ডিক্টেটর হয়ে যান এবং আন্দোলনের সমস্ত হাল উনার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের এই অধিবেশন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় যখন ভারতবর্ষের জনসাধারণ চারিদিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ শুরু করে। এবং কঠিন থেকে কঠিনতর সংগ্রাম এবং আরও বড় বড় আত্মদানের জন্যে প্রস্তুত ছিল। তারা আরও বৃহত্তম সংগ্রামের আহ্বানের জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। এই সময় যে কোন বিপ্লবী নেতৃত্বের কর্তব্য কি হওয়া উচিত ছিল? কংগ্রেসের এই অধিবেশনে নবজাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ঘোষণা পত্র বিলি করে সেই ঘোষণা পত্রের বক্তব্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল। এই ঘোষণা পত্রে বলা হয়:

"কংগ্রেস যদি বিপ্লবের—যে বিপ্লব ভারতবর্ষের বুনিয়াদ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে তার নেতৃত্ব করতে চায় তবে সে আর শুধু মাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ক্ষণস্থায়ী উৎসাহের উপর যেন নির্ভরশীল না হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার যে মৌলিক দাবী সেই দাবীকে তাদের নিজস্ব দাবীতে পরিণত করা এবং কৃষক সভার যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীকে নিজেদের কর্মসূচীতে রূপায়িত করা উচিত। ফলে এই সম্ভাবনা ততই দ্রুততর হবে যখন কংগ্রেস যে কোন বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারবে এবং সারা ভারতবর্ষের লড়াকু জনতা তাদের মৌলিক স্বার্থের জন্যে সচেতনভাবে তার পেছনে সামিল হবে।"

ভারতের বিপ্লবী শক্তি সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী মোর্চা গঠন করার এই ছিল উপযুক্ত সময়। জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে সারা দেশব্যাপী এই মোর্চা গঠন অত্যন্ত জরুরী ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই পথে অগ্রসর হন না। এবং তারা সাময়িক ভাবে এবং ব্যাপক গণসংগ্রামের কোন ডাক দেন না। প্রথম দিকে তারা খাজনা বন্ধ আন্দোলনে পা বাড়ান, যদিও সেই খাজনা বন্ধ আন্দোলন তাদের কার্যক্রমের সর্বশেষে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু এবার তারা খাজনা বন্ধের কর্মসূচীকে তাদের প্রস্তাব থেকে বাদ দিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে আরও অনেক শর্ত তারা জুড়ে দিলেন। এ

খুবই স্পষ্ট ছিল যে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর না করে তাকে সীমিত করার চেষ্টা করেন।

কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে আর একটি গুরুতর বক্তব্য উপস্থিত হয়। হসরত মোহানী এই অধিবেশনে এই প্রস্তাব রাখেন যে স্বরাজের অর্থ হচ্ছে, "সমস্ত কিছু থেকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা চাই।" শুনে সবাই আশ্চর্য হবেন যে গান্ধীজী এবং তার অনুগামীরা হসরত মোহানীর এই প্রস্তাবের জোড় বিরোধ করেন। এবং এই প্রস্তাব পাশ হতে দেন না। কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সমর্থকরা স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে দাঁড়ান, কিন্তু গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই দাবীকে বিপজ্জনক বলে মনে করেন। এঁরা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় শাসন ব্যবস্থা চান। কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশের জনসাধারণের জন্যে, আর কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বে লক্ষ্য ছিল পুঁজিপতি এবং সামন্ত প্রভুদের যৌথ স্বার্থের প্রতি।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এই দুর্বলতা ধূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তারা বুঝতে পেরেছিল গান্ধীজী কোন বৃহত্তম আন্দোলনে নামছেন না। তাই তারা নির্বিঘ্নে নিঃশ্বাস ফেলল। ভাইসরয় আহমেদাবাদ অধিবেশনের প্রস্তাব পাঠ করে লণ্ডনে এক তার বার্তা পাঠিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে নিশ্চিন্ত থাকার জন্যে বলেন।

গান্ধীজীকে কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা বানিয়ে আহমেদাবাদ কংগ্রেস বস্তুত দেশের জনসাধারণের সামনে কোন কর্মসূচী না রেখেই অধিবেশন সমাপ্ত করে। পূর্বে যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা ডিক্টেটরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের এই বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাছে ডিক্টেটর শব্দটি খুব পছন্দ সই হয়। এই শব্দ তারা ইতালীর ফ্যাসিজম থেকে গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ তার মুক্তির পথ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল। আর ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা মুসোলিনী এবং তার ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র থেকে প্রেরণা নেয়। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা এই রাস্তাকেই পছন্দ করে। ডিক্টেটর মুসোলিনীর মতো এরাও ডিক্টেটর বলতে ভালবাসতেন। এটা খুবই লক্ষণীয় যে, ডিক্টেটর শব্দের প্রয়োগ জাতীয় আন্দোলনে ১৯৩২—৩৩ পর্যন্ত ছিল। এর পরে যখন সারা দুনিয়ায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং এমন কি উদারপন্থী বুর্জোয়ারা পর্যন্ত যখন এর বিরোধিতা করতে শুরু করে, তখন থেকে কংগ্রেস নেতৃত্ব এই শব্দের প্রয়োগ ছেড়ে দেয়।

কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশন সমাপ্তির এক মাস পরেও ডিক্টেটর গান্ধীজীর কোন আদেশ দেশবাসী পায় না। কৃষকরা বিভিন্ন স্থানে খাজনা বন্ধ আন্দোলন করার জন্য হুকুম চায়। কিন্তু ডিক্টেটর কোন হুকুম দেন না। বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের (সেই সময় মাদ্রাজ প্রদেশ) গণ্টুর জেলায় ডিক্টেটরের আদেশ ছাড়াই খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন বন্ধ করতে এবং নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে খাজনা জমা দিতে হুকুম দেন।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ কংগ্রেসের ডিক্টেটর গান্ধীজীর এক অদ্ভুত কার্যক্রম দেশবাসীর সামনে হাজির হয়। উনি ভাইসরয়কে এই বলে আলিমেটাস দেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে এবং দমন-পীড়ন বন্ধ না করলে বরদৌলিতে (গুজরাত) আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। দেশের জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যগ্রতার সঙ্গে সমগ্র দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু ডিক্টেটর সারা দেশে নয়, এমন কি সারা প্রদেশেও নয়, শুধু গুজরাতের এক জেলায় এই আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলেন। দেশবাসী আশা করছিল এই নতুন সংগ্রাম স্বরাজের জন্যে শুরু হবে, কিন্তু ডিক্টেটর রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি এবং দমন-পীড়নের বন্ধের মধ্যেই আন্দোলনকে সীমিত রাখেন। অবশেষে সেই মুহূর্তও আর আসে না।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরা ঘটনা ঘটে। পুলিশ কৃষকদের উপর অত্যাচার করে, ফলে কৃষকরা থানাকে ঘিরে ফেলে এবং জ্বালিয়ে দেয়। থানার দারোগা এবং অনেক সিপাই এই আগুনে পুড়ে মারা যায়। চৌরিচৌরার এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার রুদ্র মূর্তি নিয়ে সন্ত্রাস এবং দমন-পীড়ন আরম্ভ করে। এই ঘটনার খবর পেয়েই গান্ধীজী ১২ই ফেব্রুয়ারী সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অগণিত মোর্চা সংগঠিত করে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যে লড়াই-এ সামিল হয়েছিলেন সেই লড়াকু জনতাকে ডিক্টেটর হাতিয়ার ত্যাগ করার জন্যে এবং লড়াই বন্ধ করার জন্যে হুকুম দেন। এখন শুধুমাত্র চরকা কাটো এবং সৃজনশীল কাজ করো।

এই হুকুমে দেশবাসীর মধ্যে ক্ষোভ এবং নিরাশা স্বাভাবিক ছিল। জেলে বন্দী লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই হুকুম পছন্দ করেন না। ওঁরা বন্দী অবস্থায় জেল থেকে প্রতিবাদ পত্র পাঠান। এই প্রতিবাদ পত্রের উত্তরে গান্ধীজী আরও আজব কথা বললেন। তিনি বললেন, যারা জেলে বন্দী তারা নাগরিকদের চোখে মৃত স্বরূপ, তাই জেলে বন্দী

এই সব নেতৃবৃন্দের নীতি নির্দ্ধারণ করার কোন অধিকার নেই। এই বক্তব্য সত্যি সত্যি এক ডিক্টেটরেই বক্তব্য।

গান্ধীজী না চাওয়া সত্বেও এটা লক্ষ্য করা গিয়েছে যে জাতীয় আন্দোলন দিনের পর দিন ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই ব্যাপকতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখের ঘুম কেড়ে নেয়। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ ভাইসরয় লণ্ডনে এক তার বার্তা প্রেরণ করে জানিয়ে দেন যে, "অবস্থা অত্যন্ত চিন্তাজনক।"

গান্ধীজী সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীগত স্বার্থেই এই পদক্ষেপ বাড়ান। সমগ্র দেশে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রমিক কৃষক এবং অন্যান্য শোষিত শ্রেণী তাদের শোষকগোষ্ঠীকে চিনতে সক্ষম হয়। শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীকেই নয়, দেশীয় শোষকগোষ্ঠীকেও আতঙ্কগ্রস্থ করে। এরা শ্রমিক কৃষকের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে নিন্দা করে। কৃষকরা খাজনা বন্ধ করে দিয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে পঙ্গু করে দিতে চায এবং এই খাজনা বন্ধ জমিদার শ্রেণীর স্বার্থকেও আঘাত করে। তাই ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২-এ বরদৌলী বৈঠকে এক প্রস্তাব পাশ করে গান্ধীজী এবং তাঁর সঙ্গোপাঙ্গরা খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে কংগ্রেসের নীতি বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং জমিদার শ্রেণীকে আশ্বাস দেন যে, কংগ্রেস তাদের স্বার্থের উপর কোন আঘাত হানতে চায় না।

এই ভাবে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ওঠে এবং তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা লাভ করে আবার শান্ত হয়ে যায়। এই উত্তালতা সাম্রাজ্যবাদের দমন-পীড়নের জন্যে শান্ত হয়ে যায় না, শান্ত হয়ে যায় এই জন্যে যে নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গকে নেতৃত্ব না দিয়ে তাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে হুকুম দেন। নেতৃত্ববিহীন জনতা কতদিন এভাবে লড়াই চালাতে পারেন? চার-পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীও বাহাদুর হয়ে ওঠে। ১০ই মার্চ তারা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে এবং ছ বৎসরের সাজা দেয়। বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে দেশ গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে রইল, কিন্তু গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙার মত সমস্ত পরিস্থিতি বর্তমান রয়ে গেল।

৬

নতুন শক্তির উন্মেষ

জাতীয় আন্দোলনকে বুর্জোয়া নেতৃত্ব যেভাবে খতম করেন, তাতে সারা দেশে হতাশা দেখা দেয়। আর এর জন্যে খুব শীঘ্রই দুটি খারাপ পরিণাম সামনে এসে দাঁড়ায়। যাঁরা আগে সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন সেই সব তরুণরা আবার পুরানো রাস্তায় পা বাড়ালেন। বাঙলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই সব মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীদের অসংখ্য নতুন এবং পুরানো দলগুলি আবার সন্ত্রাসবাদী কাজ-কর্মে জুটে যায়। আর একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৩-এ অমৃতসর, মুলতান, মীরাট, রায়বেরেলী, সাহারনপুরে এবং ১৯২৪-এ দিল্লী, নাগপুর, লাহোর, লখনৌ, এলাহাবাদ, কোহাট প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা হয়। মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভাকে এই দাঙ্গার কাজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করে।

জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উস্থল উঠায়। তারা সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে আরও তীব্র করে। ক্রমে দেশের সমস্ত মানুষের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

গান্ধীজীর নীতিত্বে অসন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেসের কিছু কিছু নেতা—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল ভোটে লড়াই করা এবং বিধান সভার অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালান। পূর্বে প্রায় পাঁচ বৎসর ধরে কংগ্রেসের জায়গায় এই পার্টিরই দৌরাত্ম্য ছিল। গান্ধীজীকে এই পার্টির কাছে মাথা নত করতে হয়। ১৯২৫ সালে তিনি এই পার্টির কাছেই কংগ্রেসের সমস্ত কার্যভার অর্পণ করে রাজনীতি থেকে অবসর নেন।

স্বরাজ পার্টি ছিল ভারতবর্ষের প্রগতিশীল বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্টি। এই পার্টি শ্রমিক এবং কৃষকদের সংগঠিত করার কথা তাদের কর্মসূচীতে স্থান দেয়; কিন্তু এ ব্যাপারে তারা খুব সতর্ক ছিল যাতে পুঁজিপতি এবং জমিদারদের কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। এই পার্টির নেতৃত্ব ঘোষণা করেন যে, তাঁরা বিধান

সভাতে অংশগ্রহণ করে সরকারী কাজ-কর্ম পরিচালানাকে অসম্ভব করে তুলবেন। এই জন্যে ১৯২৩-এ নভেম্বর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তাঁরা খুব সফল হন, কিন্তু বিধান সভায় গিয়েই তাঁরা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সহযোগী হয়ে ওঠেন। ক্রমেই তাদের শ্রেণী চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৯২৫-এর মে-তে ফরিদপুরে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তার ভাষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসা করেন, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর হৃদয় পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নিন্দা করেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সরকারকে সহযোগিতা করবেন বলে প্রস্তাব উঠিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না, সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসন চায়।

জুন, ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর স্বরাজ পার্টির নেতৃত্ব মোতিলাল নেহেরুর উপর এসে পড়ে। ক্রমে এই স্বরাজ পার্টির অবস্থা লিবারেল পার্টির অবস্থার মতো হয়ে পড়ে। ফলে ১৯২৬-এর নির্বাচনে একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া আর সমস্ত জায়গায় এই পার্টি ভীষণভাবে পরাজিত হয়।

স্বরাজিস্ট পার্টির পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় এবং জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতা দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন পাঠায়। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্যে ছিল না, বরং ভারতবর্ষের সংবিধান পাকাপোক্ত করার জন্যে ছিল। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা আশা করেছিল ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সহযোগিতা করবে, কিন্তু তাদের সে আশা সফল হয় না। এই কমিশনে একজনও ভারতবাসীকে রাখা হয় না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই চেহারা দেখে ভারতবর্ষের বুর্জোয়া নেতৃত্ব বুঝতে সক্ষম হন যে, আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ নেই। জনতাকে সঙ্গে করেই আন্দোলন করতে হবে এবং অবস্থা তাদের অনুকূলে আনতে হবে। খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে হয়।

এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর ও কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রভাবান্বিত করতে শুরু করে। কমিউনিস্ট আন্দোলন দেশের সবচাইতে বিপ্লবী শক্তি হিসাবে সামনে এসে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর তথা তার পার্টি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে এক বিরাট পার্থক্য ছিল। এই বুর্জোয়াশ্রেণী ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের কাছ থেকে চিন্তাধারা গ্রহণ করে, আর একে

মোকাবিলা করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টি সর্বহারার চিন্তাধারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে। যখন বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার পার্টি কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার স্লোগানকে পাপ বলে মনে করত, তখন শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার স্লোগান দেয় এবং পরবর্তী সময়ে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তার পার্টিকে এই শ্লোগান দিতে বাধ্য করে। এই নতুন বিপ্লবী শক্তিসমূহ ইনক্লাব জিন্দাবাদ স্লোগান দেয়, আর যে স্লোগান কিছুদিনের মধ্যে দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ধ্বনিত হতে থাকে। এই শক্তি ভারতবর্ষে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যেও স্লোগান দেয়। পরবর্তী সময়ে এই স্লোগান এত জনপ্রিয় হয় যে বুর্জোয়াও চুপ করে থাকে না। তারাও সমাজতন্ত্র স্থাপনের কথা বলতে শুরু করে।

১৯২২-এ গণ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেশে যে হতাশা দেখা দেয়, সেই হতাশাকে শ্রমিকশ্রেণীই প্রথম ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং কোমর বেঁধে নতুন নতুন সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘট সংগ্রাম আরও সংগঠিত রূপ নিতে শুরু করে। হরতালের সংখ্যা আগের চাইতে অনেক কমে যাওয়া সত্বেও শ্রমদিন অনেক বেশী নষ্ট হয়। যেমন, ১৯২১এ ৩৯৬টি হরতালে ৬,০০,৩৫১ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে আর এতে ৬৯,৮৪৪২৬ শ্রমদিন নষ্ট হয়। আর ১৯২৫ সালে মাত্র ১৬৫টি হরতাল সংগঠিত হয়। এই হরতালে ২,৭০,৪২৩ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে কিন্তু ১,২৫,৭৮,১২৯ শ্রমদিন নষ্ট হয়। এই সংখ্যাতত্ত্ব এই কথাই বলছে যে, ১৯২৫ সালের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী হতাশাকে একদম হটিয়ে দিয়েছে। ১৯২৮-২৯ সালে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন আরও বেশী জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯২৮-এ যে ২০৩টি হরতাল সংগঠিত হয় তাতে ৫,০৬,৮৫১ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে, আর এই হরতালে ৩,১৬,৪৭৪০৪ শ্রমদিন নষ্ট হয়।

আর অন্যদিকে ১৯২০ এবং পরবর্তী সময়ে স্থাপিত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক পার্টির রূপ দেওয়া হয় এবং ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কানপুরে কমিউনিস্টদের এক প্রকাশ্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে তার জন্মক্ষণ থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করার চেষ্টা করে। ১৯২২-২৩-এর তারা পেশওয়ার ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯২৪-এ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা চালায় এবং কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে কঠোর সাজা দেয়। কানপুর বলশেভিক মামলাতে যাঁদের অভিযুক্ত করা হয় তাঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ এবং শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) নেতা এবং ডাঙ্গে এখনও জীবিত এবং তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ স্থানীয় নেতা। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন কানপুর বলশেভিক মামলা চলছিল, তখন ব্রিটেনে লেবার পার্টির সরকার ছিল এবং মেকডোনাল্ড প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির নামে প্রকাশ্যে কাজ করার অসুবিধা থাকার জন্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক-কৃষক পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এই পার্টি গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং দেশের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করার জন্য এই পার্টি অনেক কাজ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি, চীনের বিপ্লব (১৯২৪-২৭) এবং দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি দেশের তরুণ সমাজকে প্রভাবিত করে। ফলে একদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উগ্রদল তৈরী হয়। এই দলের নেতা ছিলেন জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। আর অন্যদিকে বহু স্থানে তরুণদের সংগঠন তৈরী হয়।

এর প্রতিফলন কংগ্রেস প্রস্তাবের উপর পড়ে। ১৯২১ থেকে কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব রেখে এই দাবী করতে থাকে যে, স্বরাজের অর্থ বৈদেশিক নিযন্ত্রণ-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রতি বছরেই কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই দাবীকে পায়ে ঠেলে দেয়। কিন্তু কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) এই দাবীকে পায়ে ঠেলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে উগ্রদল তৈরী হয়েছিল তাদের সমর্থনে এই প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। ১৯২৮-এ জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের যুগ্ম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। গান্ধীজী মাদ্রাজ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থিত হচ্ছে এই সংবাদ শুনলেন, তখনও তিনি এই অধিবেশনে উপস্থিত হন না। প্রস্তাব পাশ হবার পর তিনি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, না বুঝে খুব তাড়াতাড়ি এই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনে যে নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয়েছিল তাতে দেশের অভ্যন্তরে আন্দোলনের নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮-এ সাইমন কমিশন ভারতে আসে এবং প্রায় এক বৎসরের মতো ভারতে থাকে। এই কমিশন যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এর

বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আওয়াজ উঠেছে : "সাইমশ কমিশন ফিরে যাও।" এই বিক্ষোভে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ থাকে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সবাই এতে সামিল হয়। শ্রমিক-কৃষক পার্টি এই বিক্ষোভে প্রধান ভূমিকা নেয়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী অনন্যপায় হয়ে দমন-পীড়ন শুরু করে। এদের পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ করে এবং অনেকে শহীদ হয়। লাহোরে এমনি এক বিক্ষোভ প্রদর্শন চলার সময় পুলিশ লালা লাজপত রায়কে এমন পেটায় যে, এই পিটুনির আঘাতে তিনি মারা যান। এর ফলে সারা দেশ ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে।

যখন সমগ্র দেশে "সাইমন কমিশন ফিরে যাও" এই ধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠেছিল তখন শ্রমিক-কৃষক পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী বিরাট বিরাট লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। গুজরাটের বারদোলী তালুকে কংগ্রেস খাজনা বন্ধের জন্য কৃষকদের দিয়ে যে সত্যাগ্রহ চালাচ্ছিল তা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বারদোলীর সত্যাগ্রহ নামে খ্যাত। এই আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্যে বল্লবভাই প্যাটেলকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করা হয়।

কৃষকরা খাজনাবন্ধ আন্দোলনের রাস্তায় অবতীর্ণ হয়, আর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দমনও তীব্র হয়ে ওঠে। কৃষকদের জমি, ঘর-বাড়ি, বলদ ক্রোক করে নেওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিযে যেতে থাকে। অবশেষে সরকারকে মাথা নোয়াতে হয়। বর্দ্ধিত খাজনার হার বাতিল করে দেয। এবং সরকার ওয়াদা করে যে, বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়া হবে এবং যে সব কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ওয়াদা পাওয়ার পর ১৯২৮ সালের জুলাই-এ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হয। নিঃসন্দেহে এ ছিল কৃষক আন্দোলনের এক বিরাট বিজয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পরে তার ওয়াদা রাখে না, অনেক কৃষককে জেলে বন্দী করে এবং বাজেয়াপ্ত জমি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীর আরও নাম হয়, বল্লবভাই প্যাটেলের নাম বাড়ে এবং তাঁকে সরদার বলে অভিনন্দিত করা হয়।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের বিকল্প সংবিধান রচনা করার জন্যে সমস্ত দলের একটি সম্মেলন আহ্বান করার কথা ঠিক হয়। এই ফয়সালা অনুসারে ১৯২৮-এ সমস্ত দলের সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, যদি ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় তবে তারা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করিতে প্রস্তুত। এই ঘোষণা ছিল মাদ্রাজ কংগ্রেসের

স্বীকৃত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব থেকে পিছু হটা। এই সম্মেলনে শ্রমিক-কৃষক পার্টিকেও ডাকা হয়, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার কথা যারা শিকেয় তুলে রাখে তাদের সঙ্গে কোন রকম সংযোগিতা করতে তারা রাজি হয় না।

তৃতীয় সর্ব দল সম্মেলন মে ১৯২৮-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ভারতের এক সংবিধান রচনা করার জন্যে মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করে এক কমিটি তৈরী করে। এই কমিটি যে সংবিধান তৈরী করে, সেই সংবিধান জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে নেহেরুর রিপোর্ট নামে প্রসিদ্ধ।

এই সংবিধান পূর্ণ স্বাধীনতার সংবিধান ছিল না, এ সংবিধান ছিল ডোমিনিয়ম স্টেটাস (স্বায়ত্ত শাসন)-এর সংবিধান এবং বড় বড় পুঁজিপতি তথা জমিদারদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই সংবিধান তৈরী হয়।

কমিউনিস্টরা নেহেরুর এই রিপোর্ট নিয়ে খুব সমালোচনা করে এবং তারা ডোমিনিয়ান স্টেটাসের জায়গায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা খতম করার দাবীও তারা তোলে।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরের উগ্রদলও নেহেরুর এই রিপোর্টে খুশী হয় না। অসন্তুষ্ট কংগ্রেসীরা ১৯২৮-এর নভেম্বরে ইনডিপেনডেন্স লীগ (স্বাধীনতা সংঘ) স্থাপন করে এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তোলে। জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু এই দলের নেতা ছিলেন। এঁরা ছাত্র এবং তরুণদের সংগঠিত করার জন্যে খুব কাজ করেন।

কমিউনিস্ট, শ্রমিক, ছাত্র এবং নওজোয়ানদের আন্দোলনকে শক্তিশালী হতে দেখে কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব খুব ঘাবড়িয়ে যান। এদের মোকাবিলা করার জন্যে এঁরা গান্ধীজীকে আবার সক্রিয় রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) নেহেরুর রিপোর্ট পাশ করার জন্যে গান্ধীজীকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। জওহরলাল নেহেরু গান্ধীর পক্ষে যাওয়ার জন্যেই এই প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়। সুভাষ বসু কমিউনিস্ট এবং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন।

কংগ্রেসের আপোসপন্থী নরমদলের নেতৃত্বের পিছু হটে যাওয়াকে শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টিই অনেকখানি প্রতিরোধ করে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ২০ হাজারের চেয়েও বেশী (কংগ্রেসের ইতিহাস অনুযায়ী ৫০ হাজার) শ্রমিক কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনকে ঘিরে ফেলে। গেট ভেঙ্গে তারা প্যাণ্ডেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মঞ্চকে নিজেদের কব্জায় এনে তারা সেখানে ঘোষণা করে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র

হওয়া উচিত। শ্রমিকশ্রেণীর এই দাবীকে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেবে দেখার জন্যে কথা দিতে হয়।

নেহেরুর রিপোর্ট পাশ করার পর, গান্ধীজীকে 'ওয়াদা করতে হয় যে, যদি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯২৯-এর ডিসেম্বরের মধ্যে নেহেরুর রিপোর্ট মেনে না নেয় তবে কংগ্রেস তার অহিংসা আন্দোলন শুরু করবে এবং খাজনা বন্ধ করে এই আন্দোলন আরম্ভ হবে। গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে দু বৎসর সময় দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চাপে পড়ে শুধু এক বৎসর সময় দেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করার জন্যে খুব চেষ্টা করেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এঁদের কোন সুবিধা দিতে রাজি ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই ডিসেম্বর, ১৯২৯-এ কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে বৃহৎ আন্দোলন করার জন্যে কদম ওঠায়।

৭

আন্দোলনের ঝড়

কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব ১৯২৮-এ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রমিক আন্দোলন সংস্কারবাদী বুর্জোয়া নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। নওজোয়ানদের উপরও কমিনিউস্টদের প্রভাব পড়ে। কমিউনিস্টদের প্রচেষ্টায় নওজোযানদেরও কিছু কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে, যার মধ্যে পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারতসভা বিশেষভাবে·উল্লেখযোগ্য। সরদার ভগৎ সিংহ এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কমিউনিস্টদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ফলে রিপাবলিকান আর্মির নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি রাখা হয়। ১৯২৯-এ কেন্দ্রীয় বিধান সভার অধিবেশনে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জেরার স্বীকার করেন যে দেশের তরুণদের উপর কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়ে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা যাঁদের উপর চলছিল, তাঁদের মধ্যে সাত জন কংগ্রেসের উচ্চ কমিটির (এ. আই. সি. সি.) সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্টদের এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির প্রভাব জাতীয় আন্দোলনের উপর পড়ে। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার দাবী দিনের পর দিন আরও দানা বেঁধে ওঠে। এদের এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি দেখে শুধু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীই নয়, দেশের আপোসপন্থী বুর্জোয়া নেতারাও ঘাবড়িয়ে যান।

১৯২৯-এ কেন্দ্রীয় বিধান সভায় ভাইসরয় লর্ড এরউইন বলেন, কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রচার ভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২৮-২৯-এর ভারত নামক গ্রন্থে লেখা হয়, বিশেষ করে কিছু বড় বড় শহরে শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রচার ও প্রভাবের বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ অধিকর্তারা চিন্তিত হয়েছেন। আর একদিকে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংস্কারবাদী সভাপতি শিবরাও ১৯২৮-এর মে মাসে বলেন, কমিউনিস্টরা শয়তান। এরা হরতালের প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এই জন্য এদের শ্রমিক আন্দোলন থেকে বের করে দেওয়া উচিত।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্টদের প্রভাব খতম করার জন্যে পা বাড়ায়। তারা ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতাদের এবং ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্টের মাধ্যমে শ্রমিক

আন্দোলনকে নিজেদের হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করে। সেপ্টেম্বর, ১৯২৮-এ কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যে এরা কেন্দ্রীয় বিধান সভায় পাবলিক সেফটি বিল পাশ করে। এই সময় কেন্দ্রীয় বিধান সভায় এর তীব্র বিরোধিতা হয় এবং পক্ষে-বিপক্ষে সমান সমান মতামত আসে। বিধান সভার সভাপতি বিট্ঠলভাই প্যাটেল স্বয়ং বিপক্ষে মত দেন, ফলে এই বিল পাশ হয় না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এখন এই বিলকে অর্ডিনেন্স হিসেবে রূপ দেয় এবং জানুয়ারী ১৯২৯-এ সামান্য পরিবর্তন করে আবার কেন্দ্রীয় বিধান সভায় পেশ করে।

এরও বিরোধ বিধান সভায় হয়। এর বিরোধ করতে গিয়ে পণ্ডিত মতিলাল যে ভাষণ দেন সেই ভাষণ লক্ষ্য করার মতো। মতিলাল নেহেরু কমিউনিস্টদের দৃঢ় মতাবলম্বী এবং সাহসী বলে অভিহিত করে বলেন যে, প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি কমিউনিস্টদের আদর করবে। উনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, এই আইন পাশ করে আপনারা কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রচার বন্ধ করতে পরবেন না।

এই আইন সংশোধন নিয়ে আলোচনা চলায় সময় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একদিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সারা দেশে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার শুরু করে দেয়, আর অন্যদিকে সরদার ভগৎ সিংহ এবং বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় বিধান সভা ভবনে বোমা ছুড়ে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' এবং 'আমলাতন্ত্র ধ্বংস হোক' এই স্লোগান দেয়।

কমিউনিস্টদের প্রভাব খতম করার উপায় বের করার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯২৯ সালের প্রারম্ভেই হুইটলি কমিশন ভারতে পাঠায়। সারা দেশের শ্রমিকরা এই কমিশনকে বয়কট করে। শ্রমিক আন্দোলনকে বৈপ্লবিক পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ট্রেড ডিস্পিয়ুট এ্যাক্ট পাশ করার, পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের নামে হরতাল বেআইনী করার এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সহানুভূতিমূলক হরতাল বন্ধ করার চেষ্টা করে।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ২০শে মার্চ ১৯২৯-এ কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সব থেকে বড় হামলা চালায়। এরা সমস্ত দেশের বড় বড় কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং ৩৩ জনের উপর মীরাটে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের 'অপরাধে'র জন্যে মামলা চালায়। ইতিহাসে এই মামলা মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা নামে প্রসিদ্ধ।

কমিউনিস্টরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সব চাইতে বড় সৈনিক ছিলেন। এঁরা জাতীয় আন্দোলনকে বৈপ্লবিক পথে নিয়ে যেতে চান এবং ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র স্থাপন করতে চান। এইজন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রথম কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালায়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশের নওজোয়ানদের আন্দোলনের উপর এর পর আক্রমণ সংগঠিত করে। দেশের বহু নওজোয়ান সংগঠন প্রকাশ্যভাবে এবং গুপ্তভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রকাশ্যভাবে কাজ যে সব সংগঠন করছিল তার মধ্যে পাঞ্জাবের নওজোয়ান সভার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত সংগঠনগুলির মধ্যে বাঙলা দেশের যুগান্তর, অনুশীলন দল এবং চট্টগ্রামের রিপাবলিকান আর্মি এবং উত্তর প্রদেশকে কেন্দ্র করে যাঁরা কাজ করছিলেন সেই রিপাবলিকান আর্মির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সবার লক্ষ্য ছিল সংশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা। সেপ্টেম্বর ১৯২০-এ ভগৎ সিংহ এবং শুকদেব প্রমুখ পাঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ রাজপুতনা এবং বিহারের গুপ্ত সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান সোসালিস্ট এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। এই সংস্থার সৈনিক সংগঠনের নাম রিপাবলিকান আর্মি থাকে। এই এসোসিয়েশনের শেষ লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা আনা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করা। এঁরা গণ আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামের পথ বাতলান। এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ 'বোমায় দর্শন' নামক পুস্তকে—যে পুস্তক ১৯২৯ সালে গুপ্তভাবে ছাপা হয়, তাতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কিত প্রশ্নে নিজেদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন।

ভগৎ সিংহ এবং বটুকেশ্বর দত্ত কোন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বিধান সভা ভবনে ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯-এ বোমা নিক্ষেপ করেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পাবলিক সেফটি এ্যাক্ট পাশ করানের জন্যে অনমনীয় মনোভাব দেখে কেন্দ্রীয় বিধান সভার সভাপতি বিট্‌ঠলভাই প্যাটেল ২রা এপ্রিল এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হাজির করেন। উনি এই আইন ফিরিয়ে নিতে এবং মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দিতে বলেন। মীরাটে যে মামলা চলে সেই মামলার বিষয়বস্তু পাবলিক সেফটি বিলেরই বিষয়বস্তু। অন্য কথায় বলা যায়, এই বিষয়বস্তু আদালতের বিচারাধীন আছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এই আইন বিধান সভাতে পেশ করা সংগত নয়। ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দিয়েই সরকার এই আইন বিধান সভায় পেশ করতে পারে।

এই ধরনের প্রশ্ন তুলে দিয়ে বিট্‌ঠলভাই প্যাটেল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে দেন। তবু এরা জনরক্ষা আইন পাশ করার জন্যে তোড়জোড় করে। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯-এ কেন্দ্রীয় বিধান সভার বৈঠকে ইংরেজ রাজস্ব-মন্ত্রী ট্রেড ডিস্পিয়ুট বিল এবং জনরক্ষা সংশোধন আইন চালু করার জন্যে স্পেশাল অর্ডিনান্স ঘোষণা করেন। ঠিক এই সময় কেন্দ্রীয় বিধান সভা ভবনে

বোমা নিক্ষেপ করে দুই জন দেশপ্রেমিক তরুণ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর মুখের উপর জবাব দেন। এঁরা বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করলেন না। নিজেদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্যে দুই জনেই আদালতে তাঁদের বক্তব্যে বলেন যে, তাদের এই কাজ সাম্রাজ্যবাদীদের দমন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হুশিয়ারী।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাদের দমনযন্ত্রকে আরও তীব্র করে। দেশের বিপ্লবী তরুণদের গ্রেপ্তার করে এবং লাহোর ষড়যন্ত্র কেস নামক প্রসিদ্ধ মামলা চালায়। শ্রমিক-আন্দোলনের পরে সবচাইতে বিপ্লবী আন্দোলন ছিল তরুণদের আন্দোলন। এই জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের নতুন ঝঞ্ঝাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রথমে এই দুই আন্দোলনকেই ধ্বংস করা জরুরী বলে মনে করে।

১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত সারা দুনিয়াব্যাপী এক বিরাট আর্থিক সংকটের যুগ ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর আর সমস্ত দেশ এই সংকটে হাবডুব খাচ্ছিল। মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছিল, আর পুঁজিপতিরা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে মন্দা দূর করার চেষ্টা করছিল। কাপড়ের অভাবে মানুষ উলংগ হয়ে থাকত, আর পুঁজিপতিরা কাপড় জ্বালিয়ে দিয়ে এর দাম ঠিক রাখতে চাইছিল। এই সংকট দেখিয়ে দিল পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদীরা মানুষের দুষমন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করেই মানব জীবন সুখী হতে পারে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কদম বাড়াতে পারে আর বিজ্ঞানকে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি-সাধনে লাগানো যেতে পারে।

এই জন্যেই দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এগিয়ে গিয়ে পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্য-বাদী শাসকগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে। স্বাধীন দেশসমূহে তারা সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের এবং পরাধীন দেশসমূহে আজাদীর জন্যে প্রচেষ্টা চালায়। ভারতেও জাতীয় আন্দোলনের তুফান ওঠে।

এই সময় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বুর্জোয়া নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপোস-রফা করার জন্যে খুব চেষ্টা করে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা পয়লা নম্বরের ধূর্ত। তারা কোন কিছু দিতেই প্রস্তুত ছিল না। ৩১শে অক্টোবর, ১৯২৯-এ ভাইসরয়ের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস (স্বায়ত্তশাসন) দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব দেখে মনে করলেন তাঁরা কিছু পেয়ে গেছেন। তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, যে ঘোষণাপত্র দিল্লী ঘোষণা নামে পরিচিত। এঁরা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিনিধি ভাইসরয়ের মধ্যে সততা দেখেন এবং আশা পোষণ করেন যে ব্রিটিশ সরকার ডোমিনিয়নের সংবিধান রচনা করতে এঁদের সহযোগিতা নেবে। এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দয়া পেতে এবং স্বায়ত্তশাসনের সংবিধান রচনার অংশীদার হতে উৎসুক, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে এঁরা উৎসাহী নন।

ঐ ঘোষণাপত্রে দস্তখত কারা করেছিলেন? গান্ধীজী, এ্যানি বাসেন্ট, মতিলাল নেহেরু, সরতেজ বাহাদুর সপ্রু, জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি। এই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে একমত না হয়েও জওহরলাল নেহেরু গান্ধীজীর চাপে দস্তখত করেন। সমাজতন্ত্রের জন্যে গরম গরম কথা বলেও, সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণের সময় বুর্জোয়া নেতৃত্বের চাপে মাথা নত করে তাঁদের সঙ্গে সামিল হয়ে যাওয়া জওহরলাল নেহেরুর এই অভ্যাস খুব পুরানো।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের (ডিসেম্বর, ১৯২৯) সময় সমঝোতার চেষ্টা চলে, ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়, কিন্তু কিছুই লাভ হয় না। বরং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব কত অগাধ জলে আছে।

লাহোর অধিবেশন জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে খুব গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। এই অধিবেশনের সভাপতি গান্ধীজীকে ঠিক করা হয়, কিন্তু তারা জওহরলাল নেহেরুকে এই অধিবেশনের সভাপতি করেন। এই অধিবেশন ঘোষণা করে যে, নেহেরুর রিপোর্ট কার্যকরী করার সময় পার হয়ে গিয়েছে এবং এখন পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। এ. আই. সি. সি-কে উপযুক্ত সময়ে খাজনাবন্ধ সহ আইন অমান্য আন্দোলন করার অধিকার দেওয়া হয়।

কিন্তু এই অধিবেশনে আরও দুটি ঘটনা ঘটে যা কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের চরিত্র সুস্পষ্ট করে দেয়। কংগ্রেসের পতাকায় এতদিন লাল সাদা এবং সবুজ এই রঙ ছিল। এই অধিবেশনে বুর্জোয়া নেতৃত্ব পতাকা থেকে লাল রঙ উঠিয়ে ঐ জায়গায় হলুদ রঙ রাখে। আর দ্বিতীয় ঘটনা ছিল প্যারালাল সরকারের প্রস্তাব। উগ্রদলের পক্ষ থেকে সুভাষ বসু প্রস্তাব রাখেন কংগ্রেসের লক্ষ্য প্যারালাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কংগ্রেসের শ্রমিক কৃষক তথা নওজোয়ানদের সংগঠিত করার কাজ নিজের হাতে নেওয়া উচিত। কিন্তু গান্ধীজী এবং অন্যান্যরা এ পছন্দ করেননি। তাঁরা এই প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলেন।

তবু লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাবে দেশে আনন্দ এবং উৎসাহের জোয়ার আসে। দেশের মানুষ লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল এবং খুব ব্যগ্রতা নিয়ে দেশের নেতৃবৃন্দের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

কংগ্রেসের নতুন কার্যকরী কমিটি দেশের জনসাধারণকে ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করতে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে এব' দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রতিজ্ঞা নিতে আদেশ দেন। নতুন কাযকরী কমিটি এক প্রতিজ্ঞা পত্রও তৈরী করেন, যে প্রতিজ্ঞা পত্রে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে উলটিয়ে দেওয়ার এবং ধ্বংস করার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতবাসীর আছে।

কংগ্রেসের এই আদেশে সমগ্র দেশে স্বাধীনতা দিবস খুব উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এই উৎসাহের প্রকাশ বোম্বাইয়ের ঘটনা দেখেই আন্দাজ করা যায়। কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে ছাত্র, অফিস কর্মচারী, ব্যবসায়ী এব' বুদ্ধিজীবীদের মিছিল বের হয়। হাজার হাজার মানুষ এই মিছিলে সামিল হয়। কমলা চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করে পুলিশের বেষ্টনী ভেঙ্গে কংগ্রেসের পতাকা তুলে ধরেন। বিকালের দিকে এক লক্ষ শ্রমিকের এক মিছিল ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে কংগ্রেসের মিছিলের সঙ্গে সামিল হয়। কিন্তু কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রমিকদের এই স্লোগান পছন্দ হয় না। এঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করতে প্রস্তুত হয়ে যান।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কথা ওঠে, কিন্তু সংগ্রামের রূপ এবং কার্যক্রম কি হবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। বরং ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩০-এ গান্ধীজী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়াতে এগারো দফা পেশ করেন এব' সরকার এই এগারো দফা মেনে নিলে আর আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে না এই আশ্বাস দেন। এতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তো দূরের কথা স্বায়ত্তশাসনের কথা পর্যন্ত ছিল না। এই দাবী মেনে নিলে গান্ধীজী সমস্ত আন্দোলন শিকের তুলে রাখতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদীদের বুঝতে দেরী হয় না যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বাধীনতার দাবী শুধুমাত্র দর কষাকষির জন্যেই উঠিয়েছে।

ফেব্রুয়ারী ১৯৩০-এ সাবরমতিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠক আগামী দিনের আন্দোলনের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা গান্ধীজীর হাতে তুলে দেয়। এই বৈঠকেই আন্দোলনের রূপরেখা এবং সংগঠন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। এই সমস্ত কাজ গান্ধীজীর জিম্মায় রাখে। জওহরলাল নেহেরু সুভাষ বসু প্রমুখরা স্বীকার করেন যে, তাঁরা আন্দোলনের রূপরেখা এবং কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু জানেন না।

দেশে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বড় ধরনের আন্দোলন করার মতো অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান ছিল। শ্রমিক এবং কৃষকদের যদি সম্পূর্ণভাবে আন্দোলনের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া যেত, দেশব্যাপী হরতাল এবং খাজনাবন্ধকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হত, পাশাপাশি জাতীয় সরকার কায়েম করা যেত, কোর্ট-কাছারি এবং সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করা যেত তবে এই ব্যাপক আক্রমণকে মোকাবিলা করা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত।

কিন্তু দেশ যাতে এই রাস্তায় না যায় সেজন্যে গান্ধীজী তাকে প্রতিরোধ করতে চাইছিলেন। গান্ধীজী একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসার বিরুদ্ধে, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াকু জনতার 'হিংসার' এবং স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেশব্যাপী রূপ দেওয়ার বিরুদ্ধে—এই দুই মোর্চায় দাঁড়িয়ে লড়াই করতে চাইছিলেন। ১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তিনি ভাইসরয়কে যে পত্র লেখেন তার সারমর্ম এই-ই ছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর এই দ্বিমুখী চরিত্রের এই হচ্ছে জীবন্ত প্রমাণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই বুর্জোয়া শ্রেণীকে শোষণ করছিল বলে এরা এদের বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা নিজেরাই শোষক ছিল, তাই গণ আন্দোলনকে ভয় করত। তারা গণ-আন্দালনকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায় করতে চাইছিল। গণআন্দোলনের লাগাম যাতে কখনো নিজেদের হাত থেকে ছুটে না যায় তা তারা চাইত। দেশব্যাপী আন্দোলন হলে লাগাম তাদের হাত থেকে চলে যেত। সেইজন্য গান্ধীজী প্রথম থেকেই আন্দোলনকে সীমিত করার চেষ্টা করেন। উনি লবণের উপর সরকারের ইজারাদারী খতম করার জন্যে সত্যাগ্রহ চালানো স্থির করেন, ইতিহাসে এই সত্যাগ্রহ লবণ-সত্যাগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ। এই সত্যাগ্রহেও তিনি শ্রমিক কৃষক এবং জনসাধারণকে সরিয়ে রাখার এবং তাঁর নিজের কট্টোর অনুগামীদের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করেন।

১২ই মার্চ, ১৯৩০-এ গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডিযাত্রা শুরু হয়। তিনি নিজের পছন্দ মতো ৭৮ জন অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে সাবরমতি আশ্রম থেকে ডাণ্ডিতে লবণ তৈরী করতে রওনা হন।

যাওয়ার সময় তিনি ঘোষণা করেন যে, আমি স্বরাজ নিয়ে ফিরে আসব, আর যদি তা না হয় তবে আমার মরদেহ সমুদ্রে দেখা যাবে।

৬ই এপ্রিল গান্ধীজী এবং তাঁর সঙ্গীরা ডাণ্ডিতে আইন ভঙ্গ করে লবণ বানাতে শুরু করেন। এক মাস পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী চুপচাপ দেখে এবং তাড়াতাড়ি করে গ্রেপ্তারও করে না. তখন কিন্তু সুভাষ বসু এবং

অন্যান্য উগ্রমতাবলম্বী নেতাদের স্বাধীনতা দিবসের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৯ই এপ্রিল গান্ধীজী বিদেশী কাপড় মদ ও আফিম প্রভৃতির দোকানে ধর্না দিতে, চরকায় সুতা কাটতে, বিদেশী কাপড় জ্বালিয়ে দিতে, অস্পৃশ্যতা বন্ধ করতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি করতে এবং সরকারী চাকুরী, স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিতে আদেশ দেন। এই আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। শ্রমিকরা হরতাল এবং কৃষকরা খাজনা বন্ধ শুরু করে দেয়। ভারতীয় সৈনিকরা সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। শ্রমিক এবং নওজোয়ানরা এগিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ রাজ খতম করে পাশাপাশি সরকার গঠন করতে লাগে। আন্দোলনের এই ব্যপকতা দেখে শুধু ব্রিটিশ সরকারই নয়, কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বও চমকে ওঠেন।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের (মাষ্টার দা) নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি অসীম সাহসের সঙ্গে কদম ওঠায়। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ দেখানোর জন্যে এঁরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার এবং চট্টগ্রাম শহরের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। বাইরে থেকে নতুন সেনাবাহিনী এবং নৌসেনা নিয়ে এসে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কয়েকদিন পর চট্টগ্রামের উপর আবার নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রাম থেকে হটে গিয়ে রিপাবলিকান আর্মি জালালাবাদের পাহাড়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ২৩শে এপ্রিল, ১৯৩০-এ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে এঁদের সংঘর্ষ শুরু হয়। সমস্ত সঙ্গীদের মৃত্যু এবং সংগঠন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের নিয়ে সূর্য সেন যেখানে তাঁদের গণভিত্তি ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে চলে যান। ১৯৩০ সালে এই সংগঠনের ৩০ জন সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। ১৯৩২ সালের পূর্বে নেতারা ধরা পড়েননি। ব্রিটিশ সামাজ্যবাদীরা এই বিপ্লবের অন্যতম নেতা সূর্য সেনকে ফাঁসী দেয় এবং অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখদের দীর্ঘ সাজা দিয়ে কালাপানীতে পাঠায়। বন্দী জীবনে এঁরা অধিকাংশই কমিউনিস্ট হন।

চট্টগ্রামের এই ঘটনা ছাড়াও ১৯৩০ সালের আন্দোলনের আরও দুটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ—প্রথম ঘটনা হচ্ছে পেশওয়ারের উপর জনসাধারণের আধিপত্য বিস্তার এবং গাড়ওয়ালী সৈনিকদের জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেওয়া। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে শ্রমিকরা শোলাপুর দখল করে নেয় এবং প্যারিস কমিউনের মতো শোলাপুর কমিউন স্থাপন করে।

পেশওয়ারের এই গণবিদ্রোহের অন্যতম কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের উৎপীড়ন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলে ২৩শে এপ্রিল ১৯৩০-এ জনতার অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। পুলিশ রাজনৈতিক বন্দীদের লরিতে বসিয়ে জেলে নিয়ে যাচ্ছিল। জনতা লরিকে আটকিয়ে ফেলে এবং রাজবন্দীদের মুক্ত করে দেয়। পুলিশ এতে গুলি চালায়, জনতাও গুলি চালিয়ে এর জবাব দেয়। সমস্ত শহরে ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং তাদের জো-হুজুরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য এরা মিলিটারী ব্যারাকে পালিয়ে যায়।

এই গণবিদ্রোহকে দমন করার জন্য এরপরে সেনাবাহিনী পাঠান হয়। এই সেনাবাহিনীতে ১৮ন' রয়েল গাড়ওয়ালী রাইফেলের সৈনিকরাও ছিল। ইংরেজ কর্ম-কর্তারা এদের বিদ্রোহী জনতার উপর গুলি চালাতে হুকুম দেয়। চন্দ্র সিংহ গাড়ওয়ালীর আপিলে গাড়ওয়ালী সৈনিকদের দুই প্লেটুন নিজের দেশবাসীর উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। এরা বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে হাত মিলায় এবং নিজেদের হাতিয়ার জনতার হাতে তুলে দেয়। লক্ষণীয় বিষয় এই, পেশওয়ারের পাঠান জনতার এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ইংরেজ এবং হিন্দু সৈনিকদের ব্যবহার করে। হিন্দু এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে রেখে যারা ভারতে রাজত্ব করছিল সেই শাসকগোষ্ঠী বুঝতো হিন্দু সৈনিক খুব ভালভাবেই মুসলমান জনতাকে দমন করবে। কিন্তু এখানে দেশপ্রেমের ভাবনা যে অত্যন্ত প্রবল তা প্রমাণিত হল। হিন্দু সৈনিকরা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াকু মুসলমানদের উপর গুলি না চালিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলায়।

ভারতবর্ষের সৈনিকদের এই বিদ্রোহ দেখে ব্রিটিশ শাসকরা ভয় পেয়ে যায়। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে ভারতীয় সৈনিকদের তুলে নেয় এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর শক্তিতে আবার তারা পেশওয়ারে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্মুখ যুদ্ধে সরকারী তথ্য অনুযায়ী ৫০ জন, কিন্তু সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী ৩০০ জনেরও বেশী লোক মারা যায়। গুলি না চালানোর অপরাধে গাড়ওয়ালী সৈনিকদের তিন বৎসর থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত এবং সারাজীবন কালাপানীর সাজা দেওয়া হয়।

দেশপ্রেমিক কোন মানুষই গাড়ওয়ালী সৈনিকদের এই কাজকে তারিফ না করে থাকতে পারে না। শ্রমিক-কৃষক পার্টি এক বিশেষ সংবাদ পাঠিয়ে তাদের অভিনন্দন জানায়। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতারা তাদের এই কাজকে পছন্দ করেন না। স্বয়ং গান্ধীজীর মতো নেতা এদের এই আচরণকে আপত্তিকর

বলে মনে করেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভয় প্রকট হয়ে ওঠে যে, সৈনিকরা যদি অফিসারদের আজ্ঞা পালন না করে বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে শিখে যায় তবে তারা শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বুর্জোয়াশ্রেণী এই বিপদের সম্মুখীন হোক তা কখনই পছন্দ করে না।

৮ই মে, ১৯৩০-এ শোলাপুরে পুলিশ এবং জনতার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই দিকেরই কিছু লোক মারা যায়। দ্বিতীয় দিন থেকে সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আসে, এই সময় শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। থানা, ইংরেজদের দপ্তর, মদের দোকান প্রভৃতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত শহর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করা হয়। সারা শহরের ব্যবস্থাপনা শ্রমিক ভলেণ্টিযাররা নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পাল্টা সরকার এবং শোলপুর কমিটি স্থাপিত হয়।

শ্রমিকরা জনতার সহযোগিতায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই শহরের ওপর তাদের দখল রাখে। এরা শহরের যে ব্যবস্থাপনা করে তা প্রশংসনীয়। শ্রমিকদের এই সরকার ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠাতে সাহসী হয়নি। শ্রমিক ভলেণ্টিয়ারদের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং জনতা দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে। জনসাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা চালনের জন্য যাদের বাছাই করেছিল, তারা সবাই যখন গ্রেপ্তার হয়ে গেল, তখনই শোলাপুরের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু শ্রমিক নেতাদের ফাঁসী এবং অনেকের কঠোর সাজা হয়ে যায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত এই শ্রমিক নেতাদের জন্য মেহনতী মানুষ সর্বদাই গর্ব করবে।

১৯৩০ সালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নাগা বিদ্রোহ। ব্রিটিশ রাষ্ট্র খতম করে নাগা অঞ্চলে নাগারাজ্য স্থাপন করা তাদের লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নাগা নেতা যদু নাংগকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩০ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়। যদু নাংগের শহীদের মৃত্যুবরণের পর গাইডিলির উপর নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে। গাইডিলিকে নাগারা স্নেহের সঙ্গে রাণী বলে ডাকত। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অর্থ খরচ, ভীতি প্রদর্শন এবং বিভেদ সৃষ্টি সত্ত্বেও ১৯৩২ সাল পর্যন্ত নাগারা লড়াই চালায়। এই বৎসরেই ব্রিটিশ শাসকরা নাগাদের রাণীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। এই বীরাঙ্গনাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেয়।

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গণ আন্দোলনকে সীমিত করার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় না। কৃষকরা খাজনা বন্ধ এবং শ্রমিকরা পাল্টা সরকার গঠন করতে আরম্ভ করে। দেশীয় সৈনিকদের সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কোন বিশ্বাস ছিল না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এই আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর পন্থা অবলম্বন করে, কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। যখন এই দমন-পীডন চালান হচ্ছিল তখন ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ধ্বজাধারী লেবার পার্টির সরকার ছিল। এই ঘটনা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মোকাবিলা করার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান যারা দেয় তারা নিজের দেশের পুঁজিপতিদেরই সেবক।

আন্দোলনের ব্যপকতা এবং উগ্র মেজাজ দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ভয় পেয়ে যায়। এদের মধ্যে সমঝোতার জন্য কথাবার্তা শুরু হয় এবং কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ৫ই মার্চ ১৯৩১-এ গান্ধী-ইরবিন প্যাক্ট হয়। বুর্জোয়া নেতৃত্ব সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দেয়। যখন জাতীয় আন্দোলন উচ্চতম শিখরে পৌছচ্ছিল এবং বৈপ্লবিক রূপ নিচ্ছিল, তখন স্বাধীনতা বা কোন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার না পেয়েই তাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা। পুঁজিপতি এবং সামন্তশ্রেণীর স্বার্থের জন্যে কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা, আপোষ-রফার এবং সহযোগিতার পথ বেছে নেয়। শ্রমিক-কৃষক পার্টি এবং অল ইণ্ডিয়া ইয়ুথ লীগ এই আপোষ-রফার তীব্র নিন্দা করে।

গান্ধী-ইরবিন প্যাক্টে কংগ্রেসকে আইন সঙ্গত করা হয় এবং কংগ্রেসের সমস্ত নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা হয় না। কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর থেকেই মাত্র দমন কিছুটা লাঘব করা হয়, কিন্তু বিপ্লবী শক্তির উপর দমন-পীডন পূর্বের মতোই চলতে থাকে। ৫ই মার্চ, ১৯৩১-এ গান্ধী-ইরবিন প্যাক্ট হয়, আর ২৩শে মার্চ ১৯৩১-এ ভগত সিংহ, সুখদেব এবং রাজগুরুকে ফাঁসী দেওয়া হয়। লাহোর ষডযন্ত্র মামলায় ধৃত অন্যান্য নওজোয়ানদের কঠিন সাজা হয়ে যায়। অন্যদিকে মীরাট ষড়যন্ত্র 'মামলায় ধৃত শ্রমিক নেতাদের জেলে পচিয়ে মারে এবং ন্যায় বিচারের প্রহসন করতে থাকে।

ভগত সিংহ প্রমুখদের ফাঁসীর ঠিক পরেই ১৯৩১-এর মার্চ মাসের শেষে কংগ্রেসের অধিবেশন করাচীতে আহ্বান করা হয়। কংগ্রেসের ইতিহাসে এই অধিবেশনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সরদার প্যাটেল। এই অধিবেশনের সকলে ঐক্যমত হয়ে গান্ধী-ইরবিন প্যাক্টকে সমর্থন জানায়।

এই সমঝোতার সমালোচক জওহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুও এর বিরোধিতা করে কোন ভোট দেননি। কমিউনিস্ট এবং নওজোয়ানদের গ্রেপ্তার করার ফলেই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। করাচী কংগ্রেসে এই দুর্বলতা স্পষ্ট দেখা যায়। নেহেরুর এই দোদুল্যমানতা তো কলকাতার কংগ্রেসেই দেখা গিয়েছিল, আর করাচী কংগ্রেসে সুভাষের দোদুল্য-মানতা দেখা যায়।

করাচী অধিবেশন বামপন্থী এবং দেশবাসীর কাছে মাত্র একটি কারণেই সন্তোষজনক। এই অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং পরিবহনকে জাতীয়করণ, শ্রমিকদের অধিকাব এবং ভূমি সংস্কারের উপর প্রস্তাব পাশ করে। এ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময়েও তাব ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব।

দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে এখন কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গান্ধীজীকে গোলটেবিল কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য লণ্ডনে পাঠান। প্রথম গোলটেবিল কনফাবেন্স ১৯৩০ সালের নভেম্বরে হয়। কংগ্রেস ঐ কনফারেন্স বয়কট করে। জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং উগ্রতার ভয়ে এখন সেই বুর্জোয়া নেতৃত্ব গোলটেবিল কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। ভাবতের আগামী সংবিধানের রূপবেখা রচনা করার জন্যে এই কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় কনফারেন্স ১৯৩১ সালেব শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজী এই কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করার জন্যে ১৯৩১ সালের ২৯শে আগষ্ট বোম্বাই থেকে জাহাজে রওনা হন। বোম্বাই-এর শ্রমিকরা গান্ধীজীর এই লণ্ডন-যাত্রার বিরোধিতা করে মিছিল বের করে।

ধূর্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের বেকুফ বানানের জন্যে এই সুন্দর চাল চালে। তারা নিজেদের পছন্দ মতো তাবেদারদের এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে ডাকে। এই তাবেদারদের মধ্যে গান্ধীজীর হাতে বৈঠা দেয় এবং বলে আপনিই সারা ভারতের প্রতিনিধি। আপনারাই ঠিক করুন ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা কি হবে। যে পরিণাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করছিল, তাই হল। এই তাবেদারদের সঙ্গে গান্ধীজীর মতৈক্য হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বায়ত্তশাসন পর্যন্ত দিতেও অস্বীকার করে। ফলে গান্ধীজীকে খালি হাতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১-এ ভারতে ফিরে আসতে হয়।

এই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব আন্দোলনের কোন রকম প্রস্তুতিই করেননি।

এই নেতৃত্ব সমঝোতার মাধ্যমে কিছু পাবে বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু অন্য-দিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী দমন-পীড়নের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক রাখে। গান্ধীজী লর্ড ওয়েলিংটনের সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধ তিনি রাখেন না। উপরন্তু ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩২-এ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের উপর পুরাদমে আক্রমণ করে। অনেক অর্ডিনেন্স একসঙ্গে চালু করা হয়। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এবং সংগঠকদের গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেস এবং তার সমস্ত সংগঠনকে বেআইনী করে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের সংবাদপত্রকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

জাতীয় আন্দোলনের উপর এই আক্রমণ আগের আক্রমণের চাইতে তীব্র ছিল। এক বৎসরের মধ্যে এক লাখেরও বেশী লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। পিটুনি, গুলি চালনা, লুঠতারাজ, গ্রামাঞ্চলে সাময়িক জরিমানা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতিতে বাজার উত্তপ্ত ছিল।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ছ সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু নেতৃত্ব এবং সংগঠন বিহীন দেশপ্রেমিকরা ১৯ মাস পর্যন্ত লড়াই করে। এই রকম দেশপ্রেমিকদের জন্য কে না গর্ব করবে?

গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন পর গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ দেখান বন্ধ করে দেন। তিনি অস্পৃশ্যদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর সমস্ত চিন্তা কেন্দ্রীভূত করেন। ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি ইয়ারবডা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন। এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল যাতে হরিযানা পৃথক প্রতিনিধি পাঠাতে না পারে। এই আন্দোলনের পরিণাম হিসেবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু এবং হরিজনদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতা হয়। এই সমঝোতাকে পুনা প্যাক্ট বলে। এতে গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। হরিজনদের প্রতিনিধি পৃথক থেকে যায় এবং দ্বিগুন হয়ে যায়। কিন্তু এদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করা হয় না, কারণ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকে এই রকমই চেয়েছিল। সংরক্ষিত সিটের জন্য হরিজনদের সমস্ত হিন্দুদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়।

গান্ধীজীর এই অনশন যদি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর দমনের বিরুদ্ধে হত, তবে কেমন হত? সমস্ত দেশে এমন ঝড় উঠত যে ব্রিটিশ শাসনের ভিত টলে উঠত। এমন ঝঞ্ঝায় তো কংগ্রেস নেতাদেরও ভয় ছিল।

মে, ১৯৩৩-এ গান্ধীজী আবার অনশন শুরু করলেন। এবার কি তিনি

ব্রিটিশ শাসনের দমনের বিরুদ্ধাচারণ করে অনশন করলেন? না, তিনি নিজের এবং তাঁর অনুগামীদের আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন শুরু করলেন। এবার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিনা শর্তে তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে দিল। গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে সমঝোতার পথ বের করার জন্য গান্ধীজী আবার প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু ভাইসরয় সোজাসুজি জবাব দেন যতক্ষণ না আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। কংগ্রেসের নেতারা আবও পিছু হটলেন। জুলাই, ১৯৩৩-এ গণ আইন অমান্য আন্দোলন চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই আত্মসমর্পণ এবং সমঝোতার পথ চরম সীমায় ছিল।

সমঝোতার উপায় বের করার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব গণ আইন অমান্য আন্দোলনের জায়গায় এক এক জনকে দিয়ে এই আন্দোলনের তামাশা জীইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকেও সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়। ১৯৩৩-এর আগষ্টে গান্ধীজীকে আবার গ্রেপ্তার করে। কিন্তু অনশন করার এক মাসের মধ্যে তাকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন তিনি রাজনীতি থেকে একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। ১৯৩৪-এর এপ্রিলে এক বক্তব্যের মাধ্যমে আন্দোলনের অসফলতার সমস্ত দোষ তিনি জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। মে, ১৯৩৪-এ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এ. আই. সি. সি-র (সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি) বৈঠক পাটনায় বসার অনুমতি দেয়। এই বৈঠকে কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করে দিতে এবং আগামী নির্বাচনে লড়াই করা ঠিক করে।

এই ভাবে বুর্জোয়া নেতৃত্বের জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের গৌরবময় সংগ্রাম পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের জন্য দাযী জনসাধারণ নয়, দাযী কংগ্রেসের সংস্কারবাদী, সমঝোতাপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব। যদি এই নেতৃত্ব বিপ্লবী হত, তবে দেশ ঐ সময় স্বাধীন হয়ে যেত এবং গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যেত।

৮

সংযুক্ত জাতীয় মোর্চার জন্যে সংগ্রাম

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পরে নির্বাচনে লড়াই করা ঠিক করেন। অক্টোবর, ১৯৩৪-এ বোম্বাই-এ বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনে এই কর্মপন্থা গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী শক্তির হাত থেকে নেতৃত্বকে বাঁচানোর জন্যে কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধন করেন। গান্ধীজীর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই এই সংশোধন পাস হয় যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচন এখন হবে না। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ. আই. সি. সি.) দ্বারা নির্বাচিত সভাপতি এখন থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকা প্রস্তুত করবেন।

নভেম্বর, ১৯৩৪-এ কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের নির্বাচন হয়, কিন্তু এর আগেই 'কমিউনাল এওয়ার্ড'-এর প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং এম. এস. আরে কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে যান। এঁরা ন্যাশনালিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। এই পার্টি 'কমিউনাল এওয়ার্ডের' খুব বিরোধিতা করত। নির্বাচনে কংগ্রেস ৪৪, ন্যাশনালিস্ট পার্টি ১৫ এবং মুসলিম লীগ ১৯টি সিট পায়। জানুয়ারী ১০৩৫-এ বিধান পরিষদের অধিবেশন হয়। এঁদের সামনে প্রধান প্রশ্ন ছিল সংশোধিত প্রতিক্রিয়াশীল 'ভারত সরকার বিল'। বিধান পরিষদের এই অধিবেশনে সম্পূর্ণ বিলকে নাকচ করার যে প্রস্তাব ছিল তা উত্থাপিত হয় না এবং জিন্না যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা পাশ হয়ে যায়। জিন্নার এই প্রস্তাব প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এবং কমিউনাল এওয়ার্ডের সংযোজনকে স্বীকার করে নেয়। কেন্দ্রে শুধু-মাত্র ফেডারেশন স্থাপন করা অর্থাৎ ফেডারেশনের পরিকল্পনাকে নাকচ করা হয়। কমিউনাল এওয়ার্ড মুসলমানদের পৃথক ভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার দেয়। কমিউনাল এওয়ার্ড এইভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে বৃদ্ধি পেতে এবং জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে। মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগের নেতারা একে সমর্থন করে জাতীয় আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবকের কাজ করেন।

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বাইরে দুই জায়গায় প্রতিফলিত হয়।

বামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বৃদ্ধি পায়। অনেক লোকের কাছে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের পথের দেউলেপনা রূপ খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরা নিশ্চিত হয় যে, এঁদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে এবং গণ-সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই জন্যে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীকে সংগঠিত করতে হবে।

১৯২২-এ যে ভাবে জাতীয় আন্দোলনকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৪ সালেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কংগ্রেস নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত নওজোয়ানরা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির জন্ম দেয়।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই সমাজতন্ত্রীরাও দুই ধরণের ছিলেন—সংস্কারবাদী এবং বিপ্লবী। সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস থেকে পৃথক গণ সংগঠন স্থাপন সম্পর্কে একমত ছিলেন, কিন্তু তাদের কর্মসূচীকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন। এঁরা রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে চাইতেন। বিপ্লবী চিন্তাধারার সমাজতন্ত্রীরা গণসংগঠনের তরফ থেকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এই দুই ধরনের সংগ্রামই চালানোর স্বপক্ষে ছিলেন।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরের বামপন্থীদের অনেকেই সাম্যবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়। অনেক পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী জেলখানায় মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ করে কমিউনিস্ট পার্টির খুব কাছে আসতে থাকে। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সাম্যবাদী এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তির জন্য মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চালায়। কিন্তু এতে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আরও বেশী করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত সদস্যকেই গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়। এর ফলে সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা আসা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সহযোগিতায় এক কর্মসূচীর (সংগ্রামের প্লাটফরম) ভিত্তিতে পুনরায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তৈরী করার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। আপীলের পর মীরাট মামলায় অভিযুক্তরা ছাড়া পাওয়ায় ১৯৩৩-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

এইভাবে ১৯৩৪ সালের প্রারম্ভেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনরায় স্থাপিত হয় এবং কংগ্রেসের বাইরে এবং ভিতরে তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে কাজ শুরু করে দেন। কমিউনিস্টদের সংগঠিত শক্তিকে আবার রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবল হতে দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এর উপর আক্রমণ করে। জুলাই, ১৯৩৪-এ কমিউনিস্ট পার্টি, এক ডজনেরও বেশী রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং ইয়ং ওয়ার্কাস লীগকে বেআইনী ঘোষিত করে। বহু কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক নেতাকে বিনা বিচারে জেলে বন্দী করে রাখে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঠিক পথ বাতলায়। তাঁরা বলেন যে, প্রধান কাজ হচ্ছে সমগ্র দেশে শ্রমিক কৃষক ছাত্র এবং জনতার অন্যান্য অংশের গণ সংগঠন তৈরী করা, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এদের সবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্ত মোর্চা গঠন করা এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা।

কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির ভিতরও বামপন্থীর উদ্ভব হয়। এই বামপন্থী কংগ্রেস সোসালিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জোট বেধে কাজ করতে চায়। কেরালা, অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুর প্রাদেশিক কমিটিতে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে বামপন্থী ঝোঁক এবং পার্টির মধ্যে অনেক মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের অনেক মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে এরা একমত ছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে এদের মত পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ছিল। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা ভারত সরকারের নতুন বিল সংক্রান্ত সমালোচনার সময় বিলের সেই ধারার বিরোধিতা করেন যে ধারায় বৃহৎ বুর্জোয়া এবং জমিদারদের এক অংশের স্বার্থে ঘা লাগে। বামপন্থীরা এই আইনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে চায়। এদের বক্তব্য ছিল এই আইন সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তদের মৈত্রী দৃঢ় করবে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন হলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি হবে। সমস্ত বামপন্থীরা কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির দাবীকে সমর্থন করে। এরা কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলির ভোট ব্যাপক গণ ভিত্তির উপর চায়। এদের সুস্পষ্ট মত ছিল, এ্যাসেম্বলি ততদিন পর্যন্ত আহ্বান করা সম্ভব নয়, যতদিন পর্যন্ত না ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পরাজিত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা এই পরিষদকে এক সর্বদলীয় সম্মেলনের চাইতে বেশী কিছু মনে করতেন না। • কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী

নেতারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে এবং জিতলে প্রদেশগুলিতে সরকার গঠন করার পক্ষপাতি ছিলেন। বামপন্থীরাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে ছিল, কিন্তু তারা সরকার গঠনের বিরুদ্ধে ছিল। বামপন্থীরা মনে করত, যদি কংগ্রেস সরকার গঠন করে তবে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হবে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু সমস্ত বামপন্থীরা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ আন্দোলনের রূপ দিতে চাইছিল। জনসাধারণ এবং এমনকি কংগ্রেসের মধ্যেও বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের ইউ. পি. এবং কেরালা কমিটিতে বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ. আই. সি. সি.তে এদের সংখ্যা বেশ কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯৩৫-এ জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নতুন ভারত সরকার আইন চালু করে। ১২ শতাংশের কাছাকাছি লোকের ভোট এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচিত বিধানসভাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আসল অধিকার ব্রিটিশ সরকার দ্বারা নিযুক্ত গভর্ণরের হাতেই রাখা হয়। ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দেরও নির্বাচনে অধিকার দেওয়া হয় এবং তাও একজন ইউরোপিয়ানকে কয়েক হাজার ভারতবাসীর ভোটের সমান অধিকার দেওয়া হয়। কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার স্থাপিত করার যে পরিকল্পনা ছিল তাতে দেশীয় রাজা, জমিদার এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির মদদে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি মজবুত করার ব্যবস্থা হয়।

এই আইন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সমস্ত শক্তিসমূহকে এক মোর্চায় এনে দাঁড় করায়। চীন, আলবেনিয়া (ইথোপিয়া) স্পেনে যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের যে সফলতা এই ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্যে তা প্রেরণা সঞ্চার করে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চা কায়েম করার জন্য শ্রমিকশ্রেণী এগিয়ে যায়।

অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে (১৯২৯) বামপন্থী এবং কমিউনিস্টদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেখে এন. এম. জোশী, শিব রাও, ভেঙ্কট বরাহগিরি (বর্তমান রাষ্ট্রপতি,) দেওয়ান চমনলাল প্রমুখ দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী নেতারা এই সংগঠন থেকে বেরিয়ে আসেন এবং অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন স্থাপন করেন। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে

বিরাট মত পার্থক্য থাকে। এর পরিণাম হিসাবে কলকাতা অধিবেশনে (১৯৩১) আবার ভাঙন দেখা দেয়। কমিউনিস্টররা পৃথক হয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন করে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চা কায়েম করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর একতা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই একতা কায়েম করার জন্যে কমিউনিস্টরা খুব চেষ্টা করে। ফলে, এপ্রিল ১৯৩৫-এ অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আবার একসঙ্গে মিলিত হয়। এর পর অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মোর্চা গঠন করার জন্য ডাক দেয়।

এতে কৃষক আন্দোলনও বিকশিত হয়। প্রথমে স্থানীয় কৃষক সভাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক সভা গঠন করা হয় এবং পরে এপ্রিল, ১৯৩৬-এ লখনৌতে প্রথম সর্ব ভারতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে নিজেদের দাবী-পত্র পেশ করে, সে দাবী-পত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়, ব্রিটিশ শাসন থাকতে কৃষকের মৌলিক দাবীসমূহের সম্পূর্ণ সুরাহা অসম্ভব। কৃষকদের তাই সংগঠিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য লড়াই করতে হবে। কৃষকদের জমি আর রুটির জন্যে যে লড়াই তা স্বাধীনতার সংগ্রামের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। কৃষক সভা এই দাবীপত্রকে নিজেদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কংগ্রেসকে অনুরোধ করে।

১৯৩৬-এ আরও তিনটি গণ সংগঠন তৈরী হয়—অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এ. আই. এস. এফ.), অল ইণ্ডিয়া স্টেটস পিপুলস কনফারেন্স এবং অল ইণ্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন— যার সভাপতি ছিলেন প্রেমচন্দ্র।

কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ছিল, কিন্তু তাসত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্ত জাতীয় মোর্চা কায়েম করার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিল। কংগ্রেসকেই সংযুক্ত জাতীয় মোর্চার রূপ দিতে এবং সমস্ত গণ-সংগঠনকে সাময়িকভাবে কংগ্রেসে সামিল করতে চাইছিল। কমিউনিস্ট পার্টির এই দাবীকে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, অল ইণ্ডিয়া কৃষক সভা, অল ইণ্ডিয়া স্টেটস পিপুলস কনফারেন্স এবং সাধারণ কংগ্রেসীরাও সমর্থন জানায়।

এপ্রিল, ১৯৩৬-এ কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে বামপন্থীদের শক্তির বিরাট

প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা এই অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি করেন এবং তাঁর আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়েন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বামপন্থীদের শুধুমাত্র তিন ভাগের একভাগ স্থান দিয়ে নেহেরু সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণপন্থীদের কমিটি গঠন করতে দেন। নেহেরু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বামপন্থীদের অধিকাংশ দাবগুলিকে সমর্থন করেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা তাদের অধিকাংশ দাবীগুলিকে অস্বীকার করে। গণ সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসে সামিল করার পরিবর্তে তারা গণসংযোগ কমিটি তৈরী করার প্রস্তাব করে। এই গণসংযোগের কাজ হচ্ছে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতিদের মধ্যে গিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত করা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে রাখার জন্যে দক্ষিণপন্থী নেতাদের এ ছিল একটি চাল। গণসংগঠন সমূহকে কংগ্রেসে সামিল করার অর্থ ছিল নেতৃত্ব মেহনতী মানুষের হাতে চলে যাওয়া।

ডিসেম্বর, ১৯৩৬-এ ফৈজপুরে (মহারাষ্ট্র) কংগ্রেসের পঞ্চাশতম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা আরও প্রবলভাবে দেখা দেয়, কিন্তু নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থী নেতাদের হাতেই থেকে যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা রচিত সংবিধান অনুসারে ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক বিধান সভাগুলির নির্বাচন ১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে শুরু হয়। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর বামপন্থীরা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন যে, এক প্রগতিশীল ঘোষণাপত্র রচনা করা হোক এবং তাঁদেরই নির্বাচনে দাঁড় করান হোক—যাঁরা প্রতিনিয়ত জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে লড়াই করছেন। নির্বাচনে গণসংগঠনগুলিরও সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদের অনুরোধ শিকেয় তুলে রেখে দক্ষিণপন্থীদের এবং এমনকি ঘোর প্রতিক্রিয়াশীলদের পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রার্থী করেন। এবং গণসংগঠনগুলির সহযোগিতা নিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য তাঁরা নির্বাচনের জন্যে রচিত ঘোষণাপত্রে অনেক প্রগতিশীল উদ্দেশ্য পেশ করেন। তাঁরা ঘোষণা করেন যে. কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা বিধানসভাগুলিতে 'ভারত সরকার আইন' ভাঙ্গার জন্যে যাচ্ছেন, তাকে কার্যকরী করার জন্যে যাচ্ছেন না। এই ঘোষণাপত্রে ভূমি সংস্কার, কৃষক এবং শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারী পুরুষের সমান অধিকার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি প্রভৃতির ওয়াদা করা হয়।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরাট জয়লাভ করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলি

ভীষণভাবে পরাজিত হয়। যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যাতে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। বাঙলা, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে এই পার্টিই সবচেয়ে বৃহৎ পার্টি তা প্রমাণিত হয়। একমাত্র সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে এই পার্টি সফলতা লাভ করেনি। এর থেকেও কংগ্রেসের বিরাট সফলতা এই ছিল যে, মুসলিম আসনগুলিতেও কংগ্রেস মুসলিম লীগ থেকে বেশী সিট পায়। সর্বমোট ৪৮২টি মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ মাত্র ১২৩টি সিট পায়। মুসলিম লীগ ছাড়া জমিদারদের অন্যান্য পার্টিগুলি এবং হিন্দু মহাসভাও ভীষণভাবে পরাজিত হয়।

এই নির্বাচন সুস্পষ্টভাবে এই কথা প্রতিপন্ন করল যে, যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের পথে চলেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক এবং সামন্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জাতীয় আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরাতে এবং জনসাধারণের কোন অংশকেই বিপথে চালিত করতে অপরাগ ছিল। দেশের এই দুশমনরা তখনই সুযোগ পায়, যখন কংগ্রেস নেতৃত্ব সংগ্রামের পথ ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দরকষাকষি এবং সমঝোতার পথ গ্রহণ করেন।

নির্বাচনে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এক অংশ সরকার গঠনের জন্য তোড়জোর করেন। কিন্তু এর বিরোধিতা এমন তীব্রতার সঙ্গে হয় যে, এ কাজ খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না। গান্ধীজী যে কোনো একটা পথ বের করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় গভর্নর কথা দেন যে, তিনি তাঁর নিজের বিশেষ ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবেন না। এই ওয়াদা পাওয়ার পরেই ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিজেদের সরকার গঠন করেন। ১৯৩৮ সালে সিন্ধু এবং আসামেও কংগ্রেস সরকার গঠন করে। এই সরকার কিছু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা দেয়, প্রগতিশীল সংগঠন ও পত্রিকাগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়। কিন্তু খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। নির্বাচনের ঘোষণাপত্রে যা বলা হয়েছিল তা পূরণ করার উপর জোর না দিয়ে, এঁরা জোরের সঙ্গে এই বুঝাতে লাগলেন যে সংসদীয় পথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনসাধারণের সমস্ত দাবী পূরণ করা সম্ভব। এঁরা গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা করতে শুরু করেন, শান্তিপূর্ণ গণ বিক্ষোভে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন এবং গণ-সংগঠনগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ দিতে শুরু করেন।

এঁদের অধঃপতন এখানেই থেমে থাকেনি। এঁরা এ-কথা বলতে শুরু করেন যে, পরিস্থিতি এমনই সৃষ্টি হচ্ছে যে সংঘর্ষ ছাড়াই স্বরাজ এসে যাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইংরেজদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে আসবে।

কংগ্রেসের এই বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখোশ খুব শীঘ্রই খুলতে থাকে। কংগ্রেসী সরকারগুলি সংবিধান ভেঙ্গে ফেলার কথাকে নাকের ডগায় রেখে এই সংবিধানকেই কার্যকরী করে এবং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অসহযোগের জায়গায় সহযোগিতা করতে আরম্ভ করে। এরা শ্রমিক কৃষক প্রভৃতিদের দাবীদাওয়াগুলিকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। এই জন্যে দেশের মেহনতী মানুষকে খুব শীঘ্রই বৃহৎ আন্দোলনের রাস্তায় নামতে হয়। কংগ্রেস সরকারগুলি তাদের নিজেদের আসল চেহারা দেখায় এবং এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যে সমস্ত রকম শক্তি প্রয়োগ করে।

কংগ্রেস সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী সর্বপ্রথম মোর্চা গঠন করে। ১৯৩৭-এ ৬, ৪৮, ০০০ শ্রমিক হরতালে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৩৮-৩৯-এও কমবেশী এই ধরণের হরতাল হয়। এতে শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তিও বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের এই শক্তি বৃদ্ধি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরানের জন্যে এবং সংস্কারবাদী রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের নিজেদের লোকদের নিয়ে পাল্টা ইউনিয়ন তৈরী করতে শুরু করেন এবং এই ইউনিয়ন তৈরী করতে নিজেদের সরকারকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করেন। অন্যদিকে তাঁরা শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে আইন তৈরীর চেষ্টা করেন। বোম্বাই-এ কংগ্রেস সরকার সর্বপ্রথম এই জঘন্য কাজ করে। ১৯৩৮-এ এরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্পিউটস বিল পেশ করে। অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলিও এই ধরণের আইন উত্থাপন করার জন্য রচনা করতে লাগে। দেশের বৃহৎ বৃহৎ পুঁজিপতিরা এতে খুশী হয় এবং দাবী করতে থাকে যে, এই আইন কেন্দ্রীয় বিধানসভা থেকে পাশ করা হোক যাতে সারা দেশে একে প্রয়োগ করা যায়।

এই আইনের বিরোধিতা করে বোম্বাই-এর শ্রমিকরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৮ সালের ৭ই নভেম্বর বোম্বাই-এর সমস্ত প্রান্তে একদিনের জন্যে সফল হরতাল হয়। একমাত্র বোম্বাই-এ দুই লক্ষ শ্রমিক হরতালে অংশ গ্রহণ করে। কংগ্রেস সরকারের হুকুমে পুলিশ কয়েকবার শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়। কংগ্রেসের বর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রমিক বিরোধী চেহারা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কংগ্রেস সরকারের জমিদার প্রীতি এবং শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধিতা করে কৃষকরা বিহারে জোর লড়াই শুরু করে। আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না দেখ, বিহারের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ষাট হাজার কৃষক ১৯৩৭ সালের ২৩-এ আগষ্ট পাটনায় জড় হয়। এই দিন বিহার বিধান সভার অধিবেশন আরম্ভের দিন ছিল। কৃষক সভার আবেদনকে সমর্থন করে তারা দাবী জানায়, খাজনা এবং জল কর কম করতে হবে। জমিদার কৃষকদের যে জমি বেদখল করেছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে, কৃষি আইন আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

কৃষক আন্দোলনের চাপে বিহারের কংগ্রেস সরকার সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-এ বিধান সভাতে খাজনা সম্পর্কিত আইন পেশ করে। এই খাজনা-আইনে সন্তোষজনক কিছু না থাকায় কৃষক সভা এই আইন সংশোধনের দাবী জানায়। ১৮ই অক্টোবর সারা বিহারে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। নভেম্বর, ১৯৩৭-এ আবার এক লাখ কৃষক তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে মিছিল বের করে।

ইউ পি কৃষক সভার ডাকে ১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৮-এ দাবী দিবস পালিত হয় এবং ৮০ হাজার কৃষক লখনৌতে এক মিছিল করে নিজেদের দাবী কংগ্রেস সরকারের কাছে পেশ করে।

অন্ধ্রের কৃষকরা মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকারের কাছে তাদের দাবী পেশ করার জন্যে দু-হাজার মাইল দীর্ঘ পদযাত্রা করে। জুলাই, ১৯৩৭- এ পদযাত্রা শুরু হয় এবং মার্চ ১৯৩৮-এ শেষ হয়। এই ধরণের পদযাত্রা কেরালার কৃষকরাও করে। এতে মাদ্রাজের কৃষকদের মধ্যে জাগরণ দেখা দেয়। এই ধরণের মিছিল বোম্বাই, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে হয়।

সারা দেশে কৃষক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হতে দেখে জমিদার-তোষামদকারী কংগ্রেস নেতারা কৃষকদের মধ্যে ভাঙন ধরানের জন্যে এবং কৃষক সভাগুলিকে পঙ্গু করার জন্যে পথ খোঁজেন। তাঁরা বিহারে কৃষক সভার পাল্টা সংগঠন হিসেবে খেত মজুর সভা গঠিত করেন। কৃষক সভায় যে সব কংগ্রেসীরা কাজ করছিল কোন কোন কংগ্রেস কমিটি তাদের কাজ করা বন্ধ করে দেয়। জানুয়ারী, ১৯৩৮-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই বন্ধ করে দেওয়াকে পরিপুষ্ট করে। অবশ্য হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯৩৮)-এ কাজের এমন তীব্র সমালোচনা করা হয় যে এই প্রতিবন্ধকে তুলে নেওয়া হয়।

কংগ্রেসের এই ধরণের কাজ পরিষ্কার করে দেয় যে, ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের নেতৃত্ব থেকে হটানো একান্ত জরুরী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু হওয়ার পূর্বে কয়েক বৎসর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তিসমূহ বেশ জোরের সঙ্গে এগিয়ে যায়। ফেডারেল স্কিমের বিরুদ্ধে, যুদ্ধবিরোধী প্রচার বেআইনী ঘোষিত করার বিরুদ্ধে, কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলি আহ্বানের জন্যে, কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে বেআইনী তুলে নেওয়ার জন্যে জনমত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেস, বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি এবং বিভিন্ন গণসংগঠনসমূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। দেশীয় রাজ্যগুলির জনতার আন্দোলনও শক্তিশালী হয়।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল এই সব শক্তিসমূহকে এক মঞ্চে নিয়ে আসা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী নেতৃত্বে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠন করা। কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীরা এই প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে এবং তার জন্যে চেষ্টা করে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই মোর্চার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার জন্যে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' (জাতীয় মোর্চা) নামক সাপ্তাহিক প্রকাশ করে।

কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টদের একতা বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠন করার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির বামপন্থীরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মিনু মাসানীর মতো দক্ষিণপন্থী নেতারা এই একতার বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯৩৮-এ লাহোরে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির চতুর্থ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টদের ঐক্যবদ্ধ দাবী এত প্রবল ছিল যে দক্ষিণপন্থী নেতারা পার্টি দুই টুকরা করে দিবে এই ভয় দেখিয়েই একতার দাবীকে দলিত করতে সক্ষম হন। এই ধরণের দক্ষিণপন্থী সোসালিস্টদের কল্যাণে কমিউনিস্ট এবং সোসালিস্টদের একতার সম্ভাবনা ক্রমেই নষ্ট হয়। সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠন করার জন্যে এই একতার অভাব প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

কংগ্রেস সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের সংযুক্ত জাতীয় মোর্চায় পরিণত হতে পারত। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোসালিস্ট এবং অন্যান্য গণ সংগঠন এর জন্যে প্রস্তুতও ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই ঐক্যবদ্ধ মোর্চা পছন্দ করতেন না।

এই সংযুক্ত জাতীয় মোর্চার জন্যে যে প্রবল সংগ্রাম তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার দু-তিন বৎসর আগে থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরের দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। এই সংঘর্ষ প্রধানত ফেডারেল স্কিম, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আন্দোলন,

গণ আন্দোলন প্রসার, কৃষক সভা, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং কংগ্রেসকে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চায় পরিণত করার প্রশ্ন নিয়েছিল। দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ক্রমশ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা এবং ফেডারেল স্কিমকে রূপায়িত করার জন্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে টালবাহানা দেখাতে থাকেন এবং দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আন্দোলনকে মদত দেওয়ার জায়গায় রাজা-মহারাজাদের নিজেদের বন্ধু বলতেন। কৃষক সভা এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভাঙ্গার জন্যে খেত মজুর সংঘ এবং মজদুর-মহাজনের মতো ইউনিয়ন শ্রেণী সমন্বয়ের ভিত্তিতে গঠিত করেছিলেন। ভারতীয় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর পিকেটিং এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনকে এঁরা হিংসাত্মক বলে ঘোষণা করেন। এঁরা কংগ্রেসকে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চায় রূপায়িত করার জায়গায় এক বিশুদ্ধ সংস্কারবাদী পার্টি বানানোর জন্যে চেষ্টা করেন।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে উগ্রপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্যে গান্ধীজীর পরামর্শে দক্ষিণপন্থী নেতারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সংশোধন পেশ করেন যে, নতুন সদস্যপদ নেওয়া বন্ধ করা হোক। এ. আই. সি. সি-র সদস্য ও কংগ্রেস অধিবেশনের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের নিয়ম বাতিল করা হোক এবং এখন থেকে আঞ্চলিক কমিটিগুলি তাদের মনোনীত করবে। এইভাবে যে কংগ্রেস আজাদীর সংগ্রামের অটুট হাতিয়ার হতে পারত, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব তাকে গণ আন্দোলন ভাঙ্গার হাতিয়ারে পরিণত করলেন।

ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার এবং সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা যাতে গঠিত না হয়, তার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করে যায়। তারা একদিকে সামন্তবাদীদের সংগঠিত করে এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকিয়ে দেয় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। এদের প্রেরণায় ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ জমিদারদের সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় এবং ১৯৩৯-এর ৩রা এপ্রিল অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব্ ল্যাণ্ড লর্ডস (সর্বভারতীয় জমিদার সংঘ) স্থাপিত হয়। ১৯৩৮-এ রাজা এবং নবাবদের চেম্বারর্স অব্ প্রিন্সেস্ পুনরায় সংগঠিত করা হয়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণে একদিকে মুসলিম লীগ অন্যদিকে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িকতাকে উসকিয়ে দেয়। এই দুই সংগঠনের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ছিল না, আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জতীয় আন্দোলানর নেতা কংগ্রেস।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই কৌশলকে পরাজিত করার পথ ছিল স্বাধীনতার

সংগ্রামকে শক্তিশালী করা, সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহকে কংগ্রেসে টেনে আনা এবং শক্তিশালী সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা কায়েম করা।' কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বৈপ্লবিক উপায়ে সমাধানের রাস্তায় না গিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের সঙ্গে দরকাষাকষির রাস্তায় যায়। ফলে মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়। মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দায়ী কংগ্রেসের এই দক্ষিণপন্থী নেতারাই।

যুদ্ধের সম্ভাবনায় বৃদ্ধিতে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠনের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দরকষাকষি করে কিছু হাসিল করতে চাইছিলেন। স্বাধীনতার জন্যে গণ আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে এঁরা চাইছিলেন না।

১৯৩৮-এর শেষাশেষি কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু 'সংগ্রামের রূপরেখা' পেশ করেন। এই রূপরেখায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে আল্টিমেটাম দিতে এবং যদি মেনে না নেয় তবে খুব জোরের সঙ্গে সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে বলা হয়। ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯-এ কলকাতায় বামপন্থীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন 'সংগ্রামের রূপরেখা' সমর্থন করে।

এই পটভূমিতে কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন (১৯৩৯) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গান্ধীজী এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা ডাঃ পট্টাভি সীতারামাইয়াকে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চান। বামপন্থীরা তাকে মোকাবিলা করার জন্যে সুভাষচন্দ্র বসুকে দ্বিতীয়বার দাঁড় করিয়ে দেয়। সুভাষ জিতে যান। সীতারামাইয়ার পরাজয়কে গান্ধীজী নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেন। ত্রিপুরী অধিবেশনে তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর আস্থা এবং গান্ধীজীর মনের মতো কার্যসমিতির প্রস্তাব পাশ করান। সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মনোনীত কার্যকরী কমিটিতে থাকতে সমস্ত দক্ষিণপন্থী নেতারা এবং তাঁদের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরুও অস্বীকার করেন। এইভাবে দক্ষিণপন্থী নেতারা সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে এপ্রিল ১৯৩৯-এ ইস্তাফা দিতে বাধ্য করেন এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি করেন। তাঁরা কংগ্রেসের সভাপতির পদ বামপন্থীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে বামপন্থীদের পরাজয়ে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চার সম্ভাবনা কমে

যায় এবং বামপন্থীদের মধ্যেও অনৈক্য বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তাফা দেওয়ার পর সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সম্মেলন জুন, ১৯৩৯-এ বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির প্রচেষ্টায় এই দুই পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এম. এন. রায়ের র‍্যাডিকাল কংগ্রেস মেন্‌স লীগ এবং কৃষক সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে বামপন্থী সংযুক্তিকরণ কমিটি গঠিত হয়।

জুন, ১৯৩৯-এ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা এ. আই. সি-তে প্রস্তাব পাশ করিয়ে হুকুমজারী করেন যে, কোনও কংগ্রেসী প্রাদেশিক কমিটির মতামত ছাড়া কৃষক বা অন্য কোন সত্যাগ্রহে সামিল হতে পারবে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সংক্ষেপে এই-ই ছিল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

৯

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় আন্দোলন

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ ফাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পুরানো সাম্রাজ্যবাদীরা আপসে দুনিয়াকে যে ভাগ বাটোয়ারা করে রেখেছিল ফাসিস্ট জার্মানী তা বদলিয়ে দিতে চাইছিল। তারা প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানের পরাজয়ের বদলা নিতে, পুরানো সাম্রাজ্য-বাদীদের উপনিবেশ এবং আধা উপনিবেশগুলিকে ছিনিয়ে নিতে এবং দুনিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হতে চাইছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমেরিকা এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মতো জার্মান ফাসিস্টদের (নাৎসীদের) এই জন্যে বেড়ে উঠতে দেয় যে, এড্‌লফ হিটলারের নেতৃত্বে তারা দুনিয়ার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করবে। কিন্তু যখন এই ফাসিস্টরা স্বয়ং ব্রিটেনের প্রভাবিত দেশসমূহকে আয়ত্বে আনতে আরম্ভ করে তখন বাধ্য হয়ে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে রক্ষার জন্যে ফাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়।

ফলে ১৯৩৯-এ যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সেই বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদী। একদিকে ছিল পুরানো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ফ্রান্স বেলজিয়াম হল্যাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ছিল জার্মানী ইটালী জাপান প্রভৃতি ফাসিস্ট শক্তিসমূহ।

ব্রিটেন কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার চোদ্দ ঘণ্টা পরে ভাইসরয় ভারতবর্ষকেও যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে দেন। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে সামিল করার পূর্বে তিনি ভারতবাসীর মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজনই অনুভব করেন না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই ধরণের ঔদ্ধত্যে সমস্ত দেশে বিক্ষোভের ঢেউ ওঠে। সমস্ত দেশে উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং উৎসাহ বিরাজ করছিল। তারা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর গদি উলটিয়ে দিতে ব্যগ্র ছিল। দেশকে স্বাধীন করার এক স্বর্ণ সুযোগ এসে যায়। নেতাদের আহ্বানে দেশের মানুষ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মোকাবিলায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের নেতারা কি করলেন? তাঁরা কি এই ধরণের কোন ডাক দিলেন। না, তাঁদের কাজ নিজের শ্রেণী চরিত্রের অনুকূলে ছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের হাত থেকে

রাষ্ট্রক্ষমতা ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে আনতে চাইছিলেন, ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের শোষণ এবং লুটতরাজের রাজত্বের জায়গায় ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ এবং লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁরা গণ-সংগ্রামের পথে নামতে ভয় পাচ্ছিলেন। ১৯২০-২১ এবং ১৯৩০-৩৩-এ তাঁরা দেখেছেন যে আন্দোলনকে সীমিত রাখা এবং নেতৃত্বকে নিজেদের হাতের মধ্যে রাখা খুবই কঠিন। আন্দোলনের ব্যাপক রূপ দেখে এই নেতৃত্ব দুই দুইবার আন্দোলনকে বন্ধ করে দেন। এখন আবার সেই গণ আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে তাঁরা চান না।

কিন্তু এই সময় গণআন্দোলন বেশ জোরের সঙ্গে হয়েছিল। এই গণ-আন্দোলনকে আরো জোরদার করা এবং ব্যাপকরূপ দেওয়ার সম্ভবনা সামনে বিরাজ করছিল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব কি করেন? তাঁরা একদিকে গণআন্দোলনকে প্রতিরোধ করার এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করে কিছু অধিকার পাওয়ার পথে গেলেন। সাম্রাজ্য-বাদীদের প্রতি এঁরা দয়ার সাগর হয়ে যান এবং খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করতে লাগেন যে, যখন শত্রু মুশকিলের মধ্যে আছে তখন তার উপর আক্রমণ করা হিংসার সামিল। যুদ্ধের জন্য বিপদে ফেঁসে যাওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাঁদের দয়া এবং সমবেদনাকে কি বলা যায়। নিজেদের সরকারের আমলে শ্রমিক কৃষক প্রভৃতিদের উপর গুলিবর্ষণকারী এই নেতাদের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি দরদ লক্ষ্য করার বিষয়।

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শুধু এই শর্তেই মদত দিতে প্রস্তুত হন যে, কেন্দ্রে ভারতীয়দের নিয়ে এমন সরকার গঠন করা হোক যারা কেন্দ্রীয় বিধান সভার কাছে দায়ী এবং ওয়াদা দোওয়া হোক যে যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

ব্রিটিশ শাসকরা প্রথমে ভাইসরয়ের অধীনে কার্যকরী পরিষদের আকার বর্দ্ধিত করতে এবং তাতে কিছু ভারতীয়দের সামিল করতে তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি এবং রাজ-মহারাজাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরামর্শদাতা সমিতি গঠন করতে প্রস্তুত হয়। তিন মাস পরে যুদ্ধ বিরোধী জনমত প্রবল হতে দেখে তারা আরও এক পা এগোয়। তারা ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর ১৭শে জানুয়ারী ১৯৪০-এর ঘোষণাতে ওয়াদা করে যে ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ান স্টেটাস (স্বায়ত্ত শাসন) যত তাড়াতাড়ি সম্ভবপর তত তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে, কেবলমাত্র তখনই দেওয়া হবে যখন অল্প সংখ্যকের এবং রাজা-মহারাজাদের

অধিকার এবং দাবী সমূহকে পূরণ করার গ্যারান্টি দেওয়া হবে। এর সঙ্গে এও জুড়ে দেওয়া হয় যে, ডোমিনিয়ান স্টেটাসের পর তিরিশ বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ব্রিটেনের থাকবে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে কোন প্রকার কার্যকরী কদম বাড়াতে চায় না, কিছু ফাঁকা বুলি দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সহযোগিতা নিতে চায়।

কংগ্রেসের হাতে ৮টি প্রদেশের সরকার ছিল। এই সরকারগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করা যেতে পারত, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম না করে, বরং তাদের সঙ্গে সমঝোতা এবং সহযোগিতার পথে খুঁজতে থাকেন। এঁরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন না করে, বরং চাপ সৃষ্টি করে কিছু ওয়াদা পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে মদত দেওয়ার পথ গ্রহণ করেন।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বের সাধারণ দাবীও মানতে অস্বীকার করে, তখন কংগ্রেসের সরকারগুলি অক্টোবর ১৯৩৯-এ ইস্তফা দেয়। এ থেকে ফয়দা উঠিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠী কর্তৃক নিযুক্ত সরকারগুলিতে সামিল হন এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। কংগ্রেসের সরকারগুলির পতনে মুসলিম লীগ আনন্দে 'মুক্তি দিবস' পালন করে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পদ লেহনের সুযোগ পেয়ে মুসলিম লীগের নেতারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন। মুসলমান জমিদার এবং তালুকদারদের এই প্রতিনিধিবৃন্দের এই 'মুক্তি'র অর্থ এই-ই ছিল।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম কালে ফাসিস্টরা সারা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামকে ফাসিস্টরা বুটের তলায় পিষ্ট করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপদে পড়তে দেখে কংগ্রেসের নেতারা একে দরকষাকষির সুন্দর সুযোগ মনে করেন। তাঁরা আবার বলেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পরেঁ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং কেন্দ্রে অস্থায়ী জাতীয় সরকার স্থাপিত করে তবে তাঁরা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্ব প্রকার মদত দিতে প্রস্তুত আছেন। যখন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এক পাও এগোতে প্রস্তুত নয়, তখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব অক্টোবর, ১৯৪০-এ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন।

এ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ছিল গণ আন্দোলনের তামাশা। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চান। ভারতবর্ষের জনগণ নিজেদের

স্বাধীনতার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এবারের চাপ এত প্রবল ছিল যে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব যদি কোন রকম আন্দোলন করতেন তবে গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাত থেকে বেড়িয়ে যেত। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মাধ্যমে তাঁরা আন্দোলনের লাগাম নিজেদের হাতে রাখতে চাইতেন। অন্যদিকে আবার এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করতেন। সংক্ষেপে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রধান লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা নয়, বরং শাসকগোষ্ঠীর উপর সমঝোতার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং আন্দোলনের উগ্ররূপকে সংযত করা।

আন্দোলনের এই তামাশা কি রকম ছিল? গান্ধীজীর বাছাই করা লোকরাই সত্যাগ্রহ করতে পারত। এই বাছাই করা লোকরাই সত্যাগ্রহ শুরু করার এক সপ্তাহ আগে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটকে জ্ঞাত করে দিত যে, অমুক জায়গায় অমুক দিন, অমুক সময় সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছে। আর এই সময়ের মধ্যে যদি এই ব্যক্তি গ্রেফতারের হাত থেকে বেঁচে যেত, তবে সে একাই কংগ্রেসের ঝাণ্ডা নিয়ে যেত এবং সেখানে তিন চার জনের বেশী যদি জমায়েত না হত, তবে তিন চারবার শ্লোগান দিত : এই যুদ্ধের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এর পরে তারা ফিরে আসত।

এই তামাশার পরিণাম যা হওয়ার উচিত ছিল, তাই-ই হয়। কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের সত্যাগ্রহ করতে যাওয়ার আগেই গ্রেফতার করে নিয়ে যায়, অন্যান্যদের কোন কিছু করা হয় না। ফলে তিন মাসের মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের তামাশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং আজাদীর জন্যে সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়াজ তোলে। যে দিন যুদ্ধ ঘোষণা হয় সেই দিনই মাদ্রাজে যুদ্ধবিরোধী সভা হয় এবং মিছিল বের হয়। ২রা অক্টোবর, ১৯৩৯-এ বোম্বাই-এর ৯০ হাজার শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে হরতাল করে। ৮-৯ই অক্টোবর, ১৯৩৯-এ নাগপুরে শ্রমিক কৃষক এবং ছাত্র সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সামিল হওয়ার বিরোধিতা করে এবং কংগ্রেস নেতাদের কাছে দাবী জানায় যে, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শীঘ্রই গণসংগ্রাম শুরু করা হোক। দেশের প্রতিটি প্রান্তে সভা এবং মিছিলে গণসংগ্রাম

তাড়াতাড়ি শুরু করার দাবী ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এই দাবী ওঠে যে, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মোকাবিলা করে জাতীয় সরকার গঠন করা হোক।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরো নভেম্বর, ১৯৩৯-এ প্রস্তাবে বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কাজ জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করার জন্যে যুদ্ধ-সংকটকে কাজে লাগানো। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪০-এ কমিউনিস্ট পার্টি তার ঘোষণাপত্রে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যে সংগ্রামের ডাক দেয়। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত করার এবং এই যুদ্ধকে বৈপ্লবিক উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তারা আওয়াজ তোলে: "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত কর।"

শ্রমিকরা অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৩৯ সালের শেষ তিনটি মাসে সারা দেশে ১১০টি হরতাল হয়, আর সেই হরতালে ১ লক্ষ ৭০ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে। ১৯৪০-এ তারা বৃহৎ বৃহৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, এর মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ সংগ্রাম হচ্ছে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকদের। এতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে। প্রায় ৪০ দিন পরে ১৩ই এপ্রিল ১৯৪০-এ এই হরতাল শেষ হয়। শ্রমিকদের মাইনা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই-এর এই হরতালের পর সমস্ত দেশে হরতালের মহড়া লেগে যায়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে তথা স্বাধীনতার সংগ্রামে কৃষকরাও সামিল হয়। অক্টোবর, ১৯৩৯-এ যুক্ত প্রদেশের কৃষক সভার ডাকে সারা প্রদেশে কৃষক দিবস পালিত হয়। ঐ দিন দু হাজারেরও বেশী সভা হয় এবং এই সভাগুলিতে ৩০ লক্ষেরও বেশী কৃষক সামিল হয়। তারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে তথা খাজনা কমানো এবং ঋণ আদায় বন্ধ করার দাবী করে। কৃষক সভার আহ্বানে মালাবার পাঞ্জাব এবং অন্ধ্রেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ১৯৪০ সালে কৃষক আন্দোলনও খুব জোরদার হয়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চোখে কংগ্রেস নেতাদের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বিপদজনক ছিল না, তাদের চোখে বিপদজনক ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে গণআন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল তা। তারা এই গণআন্দোলনকে দমন করার

জন্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'নেশনাল ফ্রন্ট' 'ক্রান্তি' প্রভৃতি বন্ধ করে দেয়। ভারত রক্ষা আইন বলে সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য বামপন্থীদের গ্রেফতার করা হয়। হাজার হাজার মানুষের উপর মোকদ্দমা চালিয়ে তাদের সাজা দেওয়া হয় এবং হাজার হাজার মানুষকে নির্বাসিত কিম্বা ঘরে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

এই সময় কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতারাও কমিউনিস্টদের উপর হামলা চালান। নিজের পার্টি থেকেও তাঁরা সেই সব লোকদের বের করে দেন যাদের তাঁরা কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট সমর্থক বলে সন্দেহ করতেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য ছিল যে তারা গান্ধীজীর অহিংসা তত্ত্বকে মানে না। এই দক্ষিণপন্থী নেতারা এই ধরনের শ্রেণী সংঘর্ষ এবং সমাজতন্ত্রের সমস্ত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে সোসালিস্ট পার্টিকে গান্ধীবাদী পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এই নীতিতে চলার জন্যে অধিকাংশ সংগ্রামী সদস্য কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসে এবং বেআইনী ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়।

পশ্চিমে ব্রিটেন এবং পূর্বে ইউরোপের রাশিয়া ছাড়া সারা ইউরোপকে ফাসিস্ট শক্তি বুটের তলায় পিষ্ট করে। এর পরে সমগ্র ইউরোপের শক্তি নিয়ে হিটলারের নেতৃত্বে ফাসিস্টরা দু হাজার মাইল ব্যাপি ফ্রন্টে জুন ১৯৪১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমে আক্রমণ করে, যুদ্ধ ঘোষণা পরে হয়। ফাসিস্টদের লক্ষ্য ছিল দুনিয়ার মানচিত্র থেকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ, মেহনতী মানুষের প্রথম রাষ্ট্রকে মুছে দিতে এবং তাকে আবার পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তাবে আনাতে। ফাসিস্ট ধূর্তদের লক্ষ্য ছিল পুরানো সাম্রাজ্যবাদীদের হটিয়ে সারা দুনিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার করা।

ফাসিবাদের বিজয় এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তথা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত চীনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের পরাজয়ের অর্থ ছিল অন্ধকারময় এক যুগের সূচনা, সারা দুনিয়ায় ফিনান্স ক্যাপিটালের সামরিক একনায়কতন্ত্রের রাজত্বের কায়েম—যাতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চ্যালেঞ্জ করার মতো মেহনতী মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাকে, পরাধীন দেশের জনতার স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত রকম প্রয়াসকে সামরিক বুটের তলায় পিষ্ট করা হত।

যুদ্ধের চরিত্রের এই পরিবর্তনকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ স্বীকার করে। জওহরলাল নেহেরু ডিসেম্বর

১৯৪১-এ ঘোষণা করেন যে, "দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তি আজ সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে আছে যার প্রতিনিধিত্ব রাশিয়া ব্রিটেন আমেরিকা এবং চীন করছে।"

এঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, এই যুদ্ধ এখন আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়, এখন এই যুদ্ধ দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তি এবং ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ফাসিস্টদের মধ্যে যুদ্ধ। যদি ফাসিস্টদেয় বিজয় হয়, তবে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এবং দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাও অসম্ভব হয়ে যাবে। সেই জন্যে যে কোন গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রী এবং স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ এই যুদ্ধের পরিণামকে অবহেলা করতে এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তাদের স্থান প্রগতিশীল শক্তির শিবিরে। প্রগতিশীল শক্তির বিজয় এবং ফাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের জন্যে লড়াই করা তাদের কর্তব্য।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিণাম হয় সমস্ত কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের মুক্তি, তাদের সংগঠনগুলিকে প্রকাশ্যে কাজ করার অধিকার দেওয়া এবং ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী করা। প্রায় দশ বৎসরের মতো বেআইনী অবস্থায় কাজ করার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবার প্রাকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়। ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষের সঙ্গে বহু কংগ্রেসী এবং অকংগ্রেসী গণতন্ত্রী ১৯৩৩ সাল থেকে এই বেআইনীকে তুলে নেওয়ার জন্যে দাবী করতে থাকে। তাদের এই দাবী এতদিন বাদে পূরণ হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৪১-এ কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই মাসের শেষেই বরদোলীতে কংগ্রেসের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে এক প্রস্তাব পাশ করে কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের মিত্র হিসাবে হাতিয়ার নিয়ে ফাসিস্ট শক্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছে; এই শর্তে যে, ভারতকে এক জাতীয় সরকারের নেতৃত্বে তার আপন শক্তি সংগ্রহের সুযোগ দেওয়া হোক। কংগ্রেস নেতাদের এই দাবী পুরাপুরি সঠিক ছিল, কারণ জাতীয় সরকার ছাড়া দেশের সমস্ত শক্তিকে ফাসিস্টদের বিরুদ্ধে লাগানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রস্তাব পাশ করার পর গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে যান। কারণ হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করার কথা তাঁর অহিংসার সঙ্গে খাপ খায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াঙ কাইশেক এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করেন যে, ভারতের প্রতি নয়া নীতি গ্রহণ করা হোক।

আগষ্ট ১৯৪১-এ প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্র আটলান্টিক চার্টারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী যৌথভাবে ঘোষণা করেন যে, সমস্ত রাষ্ট্রের নিজের সরকার

নির্ধারণের অধিকার আছে। আটলাণ্টিক চার্টার ভারতবর্ষের উপর যখন প্রয়োগ করার প্রশ্ন ওঠে, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল সেপ্টেম্বর; ১৯৪১-এ সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, এই চার্টার ভারত বার্মা প্রভৃতির উপর কার্যকরী হবে না। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২-এ প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, আটলাণ্টিক চার্টার দুনিয়ার সমস্ত দেশের উপরই প্রযোজ্য। তিনি এক পত্রও ব্রিটিশ সরকারের কাছে লেখেন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে সমঝোতা করার পরামর্শ দেন।

এই চাপ সত্ত্বেও ব্রিটিশের শাসকগোষ্ঠী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কোন রকম সমঝোতায় আসতে অস্বীকার করে। কিন্তু যখন জাপান ব্রিটেনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার সাম্রাজ্য ছিনিযে নেয়, বার্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করে ভারতবর্ষেব সীমান্তে এসে যায় এবং সোজা ভারতবর্ষের উপর বিপদ আনে তখনই তারা সমঝোতার জন্যে পা বাডায়। ৮ই মার্চ, ১৯৪২-এ রেঙ্গুনের উপর জাপানী ফাসিস্টরা আধিপত্য বিস্তার করে এবং ১১ই মার্চ ব্রিটিশ সরকার ক্রিপস্ মিশনের ঘোষণা করে।

স্যার স্টেফর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের এক প্রতিনিধি দল যুদ্ধে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্যে দিল্লী এসে পৌছান। কিন্তু ক্রিপস মিশন যে প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তা পুরানো প্রস্তাবেরই সমতুল্য ছিল। ব্রিটিশ শাসক এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার গঠন করতে প্রস্তুত ছিল না। বরং এই নতুন প্রস্তাবে তারা বিভক্ত করার চাল শুরু করে দেয়। ক্রিপস মিশন সফলতা লাভ করে না।

ইউরোপ এবং এশিয়ার এই দুই জাযগাতেই ফাসিস্টশক্তি যে ভাবে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল তা দেখে ভারতবর্ষের পুঁজিপতি এবং তাদের নেতারা রাষ্ট্রপুঞ্জের বিজযে সন্দিহান হয়ে উঠেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভারতবর্ষকে কিছু না দেওয়ার জিদ এই নেতৃত্বকে সহযোগিতার নীতি থেকে অসহযোগিতার এবং দুঃসাহসিক পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দেয়।

গান্ধীজীর মতো নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, জাপান ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি সাধন করবে না। তারা জাপানের সঙ্গে সমঝোতার সমর্থক হয়ে গেলেন। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী ভারতবর্ষে জাপানের অনুপ্রবেশ করলে সেখানকার সমস্ত কল কারখানা ধ্বংস করে দিতে এবং 'পোড়ামাটির' নীতির কথা যখন ওঠায় তখন গান্ধীজী এর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে যদি জাপানের হাতেই এসব পড়ে যায়, তাতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিজয়ে

সন্দিহানের কারণ থেকেই গান্ধীজী ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবকে দেউলিয়া ব্যাঙ্কের চেক বলেন। ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার নেতাদের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া হিসাবেই কংগ্রেসের ১৯৪২-এর আগষ্ট প্রস্তাব আসে।

বরদোলী কংগ্রেসের প্রস্তাবের পর যে গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান সেই গান্ধীজীর উপর আবার নেতৃত্বের ভার এসে পড়ে। জওহরলাল নেহেরু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—যাঁরা বরদোলী প্রস্তাবের কর্ণধার ছিলেন, তাঁরা গান্ধীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ৭ই আগষ্ট, ১৯৪২-এ এ. আই. সি. সি.-এর অধিবেশন বোম্বাই-এ শুরু হয়। সভাপতির আসন থেকে অধিবেশনের উদ্বোধক মৌলানা আজাদ ঘোষণা করেন যে, জাতীয় সরকার গঠন করার জন্যে সংগ্রামের সময় এসে গিয়েছে। ৮ই আগষ্টে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক আগষ্ট প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘোষণা করা হয় এবং দাবী করা হয়, ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং স্বাধীন মিত্রের মতো ফাসিবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হোক। এই প্রস্তাবের প্রথমাংশেই জোর দিয়ে বলা হয়, কংগ্রেস চীন কিম্বা রাশিয়ার আত্মরক্ষাকে কোন রকম ভাবেই দুর্বল করতে চায় না। তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের রক্ষা-ক্ষমতাকেও দুর্বল করতে চায় না। কিন্তু প্রস্তাবের শেষে বলা হয় যে, যদি এই দাবী স্বীকার করা না হয়, তবে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে বৃহৎ থেকে বৃহৎতর অসহযোগ আন্দোলন করবে।

এই প্রস্তাবের অসঙ্গতি খুবই স্পষ্ট। শেষে যে পথের কথা বলা হয়, তা অশান্তি এবং অব্যবস্থা সৃষ্টি করা এবং চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাষ্ট্রপুঞ্জের রক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার পথ ছিল, আর এই সব তখন হয় যখন জাপানী ফাসিস্ট ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে পৌছায়। এটা খুব লক্ষ্য করার বিষয় যে, সারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব গণআন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকেন, অথচ আজ সেই নেতৃত্ব ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ নয়, বৃহৎ থেকে বৃহৎতর আন্দোলন চালানোর কথা বলতে শুরু করেন। এইভাবে তাঁরা বড় রকম জুয়া খেলতে যাচ্ছিলেন। কমিউনিস্ট সদস্যরা এ. আই. সি. সি.-কে এই প্রস্তাবের প্রথম অংশকে পূর্ণ সমর্থন জানান, কিন্তু প্রস্তাবের শেষ অংশের তীব্র বিরোধিতা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের জায়গায় তারা বিকল্প কর্মসূচী পেশ করেন। এই কর্মসূচী কি ছিল? এই ছিল যে, ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর ভিত্তিতে সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা গঠন করা যাতে কংগ্রেস মুসলিমলীগ এবং অন্যান্য ফাসিস্ট বিরোধীদের সামিল করা

যায়। এই জাতীয় মোর্চা দেশের সমস্ত ঐক্যবদ্ধ শক্তির সমর্থনে জাতীয় সরকারের দাবী জানাবে। এই রাজনৈতিক দাবীকে জোরদার করে যুদ্ধ প্রয়াসে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করা হোক এবং জাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে বেসরকারীভাবে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা।

কমিউনিস্টরা অসহযোগ আন্দোলনের অংশকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব ওঠায়।

কমিউনিস্টদের প্রস্তাবে কোন রকম অসঙ্গতি ছিল না। এতদিন পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের যে নীতি গ্রহণ করে তার সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রস্তাব সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তারা মনে করত ভারতবর্ষের জনসাধারণ ফাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খোলা মনে তখনই অংশ গ্রহণ করবে যখন দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। এই জন্যে তারা জাতীয় সরকারের দাবী করতে থাকে। তাঁরা এও-ও বুঝত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় জাতীয় সরকার গঠন করতে দেবে না। এই জন্যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ফাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণের নায্য ভূমিকার বিকল্প পথ তারা বাতলায়। এই দুটির জন্যে তারা সারা দেশের জনসাধারণকে, সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিকে জাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করাতে চায়। এই ধরণের গঠিত বিশাল সংযুক্ত জাতীয় মোর্চা একদিকে ফাসিবাদকে পরাজিত করতে সহায়ক হত এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করতে তথা জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্যে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে উঠত।

কিন্তু কমিউনিস্টদের এই প্রস্তাব এ. আই. সি. সি গ্রহণ করে না। তার পক্ষে শুধু মাত্র তেরটি ভোট পড়ে। কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা উত্থাপিত প্রস্তাব প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতাতে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জাতীয় আন্দোলনকে বদনাম করার সুযোগ দেয়। তারা ৯ই আগষ্টেই কংগ্রেসের নামকরা নেতাদের গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেস নেতারা এ কল্পনাও করেননি।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এই আক্রমণে ভারতবাসীর ক্ষোভে জ্বলে ওঠা খুবই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল। তারা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের চিন্তানুসারে গান্ধীজীর 'ইংরেজ, ভারত ছাড়া'র স্লোগান কার্যকরী এবং ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে শেষ করে জাতীয় সরকার স্থাপনের চেষ্টা করে।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পাশবিকতা সীমাহীন ছিল। তারা কঠোর থেকে কঠোরতর দমন-পীড়ন চালায়। সরকারী হিসাব অনুসারে ৯ই আগষ্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬২,২২৯ জনকে গ্রেফতার করে, ভারতরক্ষা আইনে

১৮,০০০ জনকে নজরবন্দী করে এবং পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ৯৪০ জন নিহত হয় এবং ১৬৩০ জন আহত হয়। নেতৃত্ববিহীন জনতার সমস্ত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও তাদের বিদ্রোহ মিলিটারী এবং পুলিশের বল প্রয়োগের দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এই ঘটনার পর জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নিশ্চেষ্টতা, হতাশা এবং মানসিক অশান্তির সময় আরম্ভ হয়। এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়, মুসলিমলীগ শক্তিশালী হয়। অন্যদিকে বাঙলার দুর্ভিক্ষে (১৯৪৩) স্বয়ং সরকারী ফেমিন ইনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৫ লক্ষ এবং অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের বেসরকারী রিপোর্ট অনুসারে ৩৫ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়।

হতাশার এই যুগকে ধ্বংস করার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি খুব চেষ্টা করে। তারা জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের মুক্তির জন্যে আন্দোলন করে। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সাহায্য করার জন্যে গণসংগঠন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নিয়ে গণখাদ্য কমিটি এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত করে। তারা শ্রমিক কৃষক ছাত্র মহিলা প্রভৃতিদের সংগঠিত করে, দেশের মধ্যে যে হতাশা চলছিল তা দূর করার জন্যে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে শ্রেণীসচেতন নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা করে। এর জন্যে তাদের শক্তি ভীষণভাবে বেড়ে যায়।

আগষ্ট আন্দোলনের ঘটনা গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, নেতাদের গ্রেফতারে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেরা যা বুঝেছে সেইভাবে করেছে। তারা রাস্তা-ঘাট খুঁড়ে দেয়, তার কাটে, রেল লাইন তুলে ফেলে, স্টেশন জ্বালিয়ে দেয়। দেশের ভিতর এমন তত্ত্বও ছিল যা জাপানী ফাসিস্টদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিল। তাদের যুক্তি ছিল, জাপানী ফাসিস্টদের মদতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হটানো যাবে এবং পুনরায় জাপানীদের সঙ্গে মিমাংসা করা যাবে। এই ধরণের চিন্তা ভাবনার উদ্ভাবক ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির প্রভৃতির নেতারা ছিলেন। এঁদের এই নীতির পেছনেও ফাসিস্ট শক্তির বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস কাজ করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ভাঙচুর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। তাঁদের এই নীতি কার্যত ফাসিস্ট শক্তির সহায়ক এবং দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে ছিল। পরবর্তী ঘটনা পরিস্কার করে দেয় যে, তাঁদের নীতি ষোল আনাই দেউলেপনা ছিল।

কংগ্রেসের নেতারা যতদিন বন্দী ছিলেন ততদিন তাঁরা বলেছেন আগষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন রকম সম্পর্ক নেই, এ কংগ্রেসের আন্দোলন

নয়। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ জওহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যুক্ত বক্তব্যে বলেন যে এ. আই. সি. সি বা গান্ধীজী কোন আন্দোলন শুরু করেননি। এর পূর্বে গান্ধীজী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে পত্র লিখে এই কথাই বলেন। তিনি এও-ও লেখেন যে, যে সব ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীই দায়ী, কারণ তারা এমন সব নেতাদের গ্রেফতার করেছে, তাতে জনসাধারণের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যখন কংগ্রেসের নেতারা মুক্ত হয়ে বাইরে এলেন, তখন তাঁরা দেশের অবস্থা দেখে বলতে শুরু করেন যে আগষ্ট আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। এ ছিল চরম সুবিধাবাদ।

পৃথিবী রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বেশ জোরের সঙ্গে বদলাতে লাগে। ফাসিস্ট শক্তির অগ্রগতি রোধ হয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ পুনরায় তাদের পেছনে হটাতে শুরু করে। গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতারা বুঝতে পারেন ফাসিস্ট শক্তির পরাজয় এখন সুনিশ্চিত। তাঁদের সুরেও পরিবর্তন আসে। ফলে যখন ৬ই মে, ১৯৪৪-এ গান্ধীজীকে স্বাস্থ্যের কারণে মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তিনি মুক্তি পেয়েই ৮ই আগস্ট ১৯৪২-এর প্রস্তাবের অসহযোগ আন্দোলনের অংশকে ফিরিয়ে নেন। ঐ বৎসরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস নেতারা পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দর কষাকষির পথে যান। এই দরকষাকষির পরিণাম ১৯৪৫-এর সিমলা সম্মেলন।

কেন্দ্রীয় বিধান সভায় কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা ভুলভাই দেশাই এবং মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী লিয়াকত আলীর মধ্যে অস্থায়ী জাতীয় সরকার সম্পর্কে এক সমঝোতা হয়। এই ঠিক হয় যে, এই সরকার কংগ্রেসের শতকরা ৪০ জন, মুসলিম লীগের শতকরা ৪০ জন এবং বাদবাকী অন্যান্যদের শতকরা ২০ জন প্রতিনিধি থাকবে। এই প্রস্তাব ভাইসরয় লর্ড বেবেলের কাছে পেশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর লর্ড বেবেল সিমলায় ১৪ই জুন, ১৯৪৫-এ সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্যে কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠি বদমায়েশী করে। তারা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে লড়াই বাধানোর জন্যে ভুলাভাই দেশাই-লিয়াকত আলী প্রস্তাবকে পরিবর্তন করে। তারা প্রস্তাব করে অস্থায়ী সরকারে শতকরা ৫০ জন বর্ণ হিন্দু, শতকরা

৪০ জন মুসলমান এবং শতকরা ২০ জন অন্যান্যরা থাকবে। এই প্রস্তাব কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের উভয়ের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। কংগ্রেস নিজেকে শুধুমাত্র বর্ণ হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিতে পারে না এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেসী মুসলমানদের শতকরা ৪০টি আসনের মধ্যে থেকে একটি আসনও দিয়ে কংগ্রেস থেকে কম আসন নিতে স্বীকার করতে পারে না। ফলে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয় না। দুঃখজনক ঘটনা এই যে, কংগ্রেস নেতারাও ব্রিটিশ সাম্রাজবাদের কৌশল দেখতে পারেননি। তাঁরা সিমলা সম্মেলনের অসফলতার সমস্ত দোষ মুসলিম লীগের মাথায় চাপিয়ে দেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোন দোষ দেখেন না। অন্যদিকে মুসলিম লীগ সমস্ত দোষ কংগ্রেস এবং হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচণ্ডভাবে উসকিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী গঠন এবং আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন করা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২-এ সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী জাপানীদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে। এতে ৪০,০০০ ভারতীয় সৈনিক ছিল। জাপানী সেনাপতি কর্নেল ফুজিয়ারা ক্যাপ্টেন মোহন সিংহকে এই ভারতীয়দের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যে জাপানীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করার জন্যে উৎসাহিত করেন। এই ঘটনা ১৯৪২-এ ঘটে। জুলাই ১৯৪৩-এ সুভাষ বসু এসে এই সেনাবাহিনীকে নিজের হাতে নেন।

সুভাষেরও ফাসিস্টশক্তি বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস ছিল। এই ফাসিস্টশক্তির সহায়তায় দেশ স্বাধীন করার পথে তিনি অবসর হন। তিনি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চোখে ধুলা দিয়ে কলকাতার নিজের বাসস্থানে নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যান, কাবুল হয়ে তিনি বার্লিনে পৌছান, হিটলারের সঙ্গে মিলে পরিকল্পনা করেন এবং পরিশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করার জন্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌছান। তাঁর এই সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আই. এন. এ. নামে খ্যাত।

সুভাষ চন্দ্র বসু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩-এ স্বতন্ত্র ভারতের অস্থায়ী সরকার অর্থাৎ আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরকারের প্রধান ছিলেন স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র—যাঁকে এখন নেতাজী বলা হয়। সুভাষের এই নয়া পদবী হিটলারের ফুয়রর, মুসোলিনীর ডিউস, ফ্রাঙ্কোর কাদজোর সমতুল্য ছিল। এ পদবী ফাসিস্ট নেতাদের নকল ছিল।

জাপানীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সেনা ভারত-বর্মা সীমান্তে আসে। মণিপুরের উপর তাদের অধিকারও বিস্তার হয়। কিন্তু জাপানী এবং অন্য ফাসিস্টদের পরাজয় সুভাষের স্বপ্নকে ভেঙ্গে দেয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সৈনিক গ্রেফতার হয। বলা হয় যে, এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। আজও এর সত্যতা নিয়ে মতভেদ আছে।

সুভাষ চন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় না, কিন্তু তাদের পথ ভুল ছিল। কংগ্রেসের অন্যান্য বুর্জোয়া নেতৃত্বের মতো সুভাষ চন্দ্র বসুও বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা এবং শক্তির ভারসাম্য উপলব্ধি করতে ভুল করেন। ফাসিস্ট শক্তির বিজয়ের বিশ্বাস তাঁকে এই ভুল পথে নিয়ে যায়।

অসমাপ্ত বিপ্লব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৫-এ শেষ হয়। এই মহাযুদ্ধ শেষ হতেই সমস্ত দুনিয়াতে বিপ্লবের এক বিরাট ঢেউ ওঠে। ভারতবর্ষও এই ঢেউ-এর স্পর্শ থেকে বাঁচে না।

সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ওঠায় শ্রমিক শ্রেণী। ১৯৪৫-এর দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় প্রতিটি উদ্যোগেই হরতালের ঢেউ ওঠে। এই বছরেই কমপক্ষে ৮৫০টি হরতাল হয়, আর সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে ৭,৪৭,০০০ শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে। প্রায়শই এই হরতালগুলি বড় বড় সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। যেমন আগষ্ট ১৯৪৫-এ বেনারসের সংঘর্ষে ১৭ জন মারা যায় এবং প্রায় দু হাজারের মতো লোক গ্রেপ্তার হয়। দেশের অন্যান্য অংশেও এমন ঘটনা ঘটে।

১৯৪৫-এর দুটি ঘটনা ভারতবর্ষকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে অত্যন্ত তীব্র করে। প্রথম ঘটনা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামকে দমন করার জন্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রেরণ এবং দ্বিতীয় ঘটনা আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর অফিসারদের উপর মোকদ্দমা। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বলতর হয়ে পড়তেই ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দো-চীনের জনতা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজস্ব সরকার গঠন করে। স্বাধীনতার এই সংগ্রামকে দমন করার জন্যে, ওলোন্দাজ এবং ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের রাজ পুনরায় এখানে কায়েম করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাঠাতে শুরু করে। ভারতবর্ষের জনতা এর বিরোধিতা করে। তারা ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দো-চীনের জনসাধারণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে নিজেদের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করত। এ ছিল ভারতীয় জনসাধারণের বর্দ্ধিষ্ণু রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৫-এ সারা দেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস পালিত হয়। বড় বড় শহরে বড় বড় সভা হয়, বড় বড় মিছিল বের হয়। বোম্বাই এবং কলকাতার ডক শ্রমিকরা সামরিক সম্ভার ও রসদ নিয়ে যে জাহাজগুলো ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার কথা তাতে মাল তুলতে অস্বীকার করে। সমস্ত দেশে আওয়াজ ওঠে: সাম্রাজ্যবাদ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাড়ো। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর চিফ্ অব্ স্টাফ কর্ণেল শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন

টিল্লো এবং লেফটেনান্ট সহগলের উপর দিল্লীর লাল কেল্লায় নভেম্বর ১৯৪৫-এ মোকদ্দমা চালায় এবং জানুয়ারী ১৯৪৬-এ তাঁদের কঠোর দণ্ড হয়। এর বিরুদ্ধে সারা দেশে ঝড় ওঠে। কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হয়। এই সংঘর্ষে পুলিশ এবং মিলিটারীর হাতে ২৩ জন মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। জনতার সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি হয়। অন্যান্য শহরগুলিতেও প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ হয়।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আব্দুর রসিদকে সাত বৎসরের সাজা দেয়। জনসাধারণের ক্ষোভ আবার ফেটে পড়ে। কলকতার রাস্তায় আবার লড়াই হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয়। এতে ৪৬ জন নিহত হয় এবং ৪০ জনেরও বেশী আহত হয়। বোম্বাই, দিল্লী, মীরাট, পেশওয়ার প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ হয়।

১৯৪৬-এ শ্রমিকরা আরও বেশী সংখ্যায় সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। সরকারী হিসাব অনুসারে ঐ বৎসরে ১৯,৫১,০০০ শ্রমিক হরতালে অংশ গ্রহণ করে। গোয়ালিয়রে পুলিশের গুলিতে ২৭ জন মারা যায়। শ্রমিক এবং মুসলিম লীগের নেতারাও ঘাবরিয়ে যান।

১৯৪৬ সালে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীতে অসন্তোষের ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। জানুয়ারী, ১৯৪৫-এ বোম্বাই-এ বিমান বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকরা হরতাল করে। তাদের দাবী ছিল ভারতীয় বৈমানিকদের এই অধিকার দেওয়া হোক যা ভারতের বিমান বাহিনীর ব্রিটিশ বৈমানিকদের দেওয়া হয়েছে এবং পার্থক্য খতম করা হোক। এই হরতালে বিমান বাহিনীর ১৫০০-এর বেশী বৈমানিক অংশ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এর নৌ-সেনা বিদ্রোহ। পার্থক্য খতম করার এবং অর্থ নৈতিক দাবীর মধ্যেই নৌ সেনাদের দাবী সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের দাবী পুরোপুরি রাজনৈতিকও ছিল। অর্থ নৈতিক দাবীসমূহের প্রতি ইংরেজ শাসনকর্তারা এমন ভাব দেখায় যে, তাতে মনে হয় যেন ভারতীয় নৌ সেনারা ভিক্ষা চাইছে। তাদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর ব্যারাকের গেটের উপর শ্লোগান দেখা যায়, 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো', 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ'। এই শ্লোগান লেখার জন্যে রেডিও অপারেটর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাসনকর্তারা তাঁকে কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ করে। এর প্রতি উত্তরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী

ব্যারাকের সমস্ত নৌ সেনারা হরতালে সামিল হয়। দুপুরের দিকে যুদ্ধ জাহাজ তলোয়ারের সমস্ত নৌ-সেনা হরতালে সামিল হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী, বোম্বাই-এর উপকূলের নৌ-বাহিনীর সমস্ত সংস্থা এবং বন্দরের বিশটি জংগী জাহাজে হরতাল হয়। বিশ হাজার নৌ-সেনা হরতালে সামিল হয়। জাহাজগুলি থেকে ইউনিয়ন জাক নামিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পাতাকা একসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয়। নৌ-সেনারা ইউনিফর্ম পরেই বোম্বাই-এর রাস্তার উপর কংগ্রেস মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা একসঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তারা স্লোগান দেয়ঃ জয়হিন্দ! ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ! হিন্দু-মুসলিম এক হো! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাও! ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈনিকদের ফিরিয়ে আন।

এই হরতাল করাচীতে যে সব যুদ্ধ জাহাজ নোঙর করা ছিল সেখানেও হয়—এর মধ্যে 'হিন্দুস্থান'-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ২১শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমস্ত নৌ-সেনা বিদ্রোহে সামিল হয় যায়। নৌ-বাহিনীর কারখানার শ্রমিক এবং ডক শ্রমিকরাও হরতালে সামিল হয়। নৌ-বাহিনীর এই হরতালকে পরিচালনা করার জন্যে পাঁচ জনকে নিয়ে একটি হরতাল কমিটি গঠিত হয়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী নৌ-সৈনিকদের দাবী-দাওয়াকে বিচার বিবেচনার বদলে বল প্রয়োগের দ্বারা সামাধা করতে চায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ব্রিটিশ সৈনিকরা বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করে। কৈসল ব্যারাকের (বোম্বাই) বাইরে সাত ঘণ্টা ধরে খণ্ড যুদ্ধের পরে যুদ্ধ থেমে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় প্রহরে এডমিরল গাডফে আলটিমেটাম দেন ; এখনই আত্মসমর্পণ করো, তা নাহলে সমস্ত শক্তি দিয়ে পিষ্ট করা হবে, তাতে নৌ-বাহিনী একেবারে ধ্বংস হয়ে যাক তাতে ক্ষতি নেই। এই হুমকীকে বাস্তব রূপদানের জন্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ ফ্লিট চেয়ে পাঠায়।

এই পরিস্থিতিতে নৌ-সেনারা দেশের জনসাধরণের কাছে, দেশের তিনটি বৃহৎ রাজনৈতিক পার্টির কাছে অর্থাৎ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সাহায্যের আবেদন করে। কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের বুর্জোয়া এবং সামন্ত নেতৃত্ব মদত করার জায়গায় ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর খয়েরখাঁয়ের কাজ করেন। তাঁরা নৌ-সেনাদের নিন্দা করেন এবং তাদের আত্মসমর্পণ করার জন্যে পরামর্শ দেন। নৌ-সৈনিকদের এই সংগ্রামকে শ্রমিকশ্রেণী এবং তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ সমর্থন জানায়।

২২শে ফেব্রুয়ারী নৌ-সৈনিকদের সমর্থনে বোম্বাই-এ নৌ-সৈনিকদের কেন্দ্রীয় হরতাল কমিটির আহ্বানে হরতাল হয়। কংগ্রেস নেতারা এই হরতালের বিরুদ্ধে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রচার চালান। কিন্তু তা সত্বেও হরতাল অভূতপূর্ব ভাবে হয়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পুলিশ এবং মিলিটারীর দ্বারা বলপ্রয়োগ করে এই হরতালকে রক্ত-বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চায়। সরকারী সংখ্যাতত্ব অনুসারে এদের গুলির বর্ষনে—তিন দিনে (২১-২৩শে ফেব্রুয়ারী) ২৫০ জন ভারতীয় শহীদ হন।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা নৌ-সৈনিকদের আত্মসমর্পণ করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁরা ওয়াদা দেন এই হরতালের জন্যে নৌ-সেনাদের কোন প্রকারের দণ্ড দেওয়া হবে না। তাঁদের চাপ সৃষ্টির জন্যে নৌ-সেনারা আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ করার সময় কেন্দ্রীয় হরতাল কমিটির সভাপতি তাঁর শেষ বক্তব্যে বলেন, "আমরা ভারতবর্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করছি, ব্রিটেনের কাছে নয়।"

গণ আন্দোলনের ঝঞ্ঝার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ, বিমানবাহিনী এবং শেষে নৌ-সেনাদের হরতাল কি ইঙ্গিত বহন করছিল? এই ইঙ্গিত বহন করছিল। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি বিল্পবের জন্যে পরিপক্ক ছিল। নৌ-সৈনিকদের হরতাল বিপ্লবের বিউগুল ছিল, ঠিক যেমন রাশিয়ার ১৯০৫সালের 'পোটেমকিন যুদ্ধ জাহাজ, ১৯১৭সালের 'ক্রান্সনাদ' যুদ্ধ জাহাজ এবং ১৯১৮সালের জার্মানের 'কীল' যুদ্ধ জাহাজ বিপ্লবের প্রারম্ভে বিউগুল বাজিয়ে ছিল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা বিপ্লবী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন সংস্কারবাদী। তাঁরা দেশের স্বাধীনতার চাইতে পুঁজিপতি এবং জমিদারদের স্বার্থকে বেশী ভালবাসতেন। বিপ্লবের ঝঞ্ঝায় কেবল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীই নয়, দেশী শোষকরাও ধ্বংস হয়ে যেত—দেশের শ্রমজীবী মানুষের রাজ স্থাপিত হত, দেশ দ্রুত গতিতে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেত। পুঁজিপতি এবং সামন্তদের মুখপাত্র কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতাদের, প্রধানত জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব করছিলেন সেই কংগ্রেসের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে বিপ্লবের এই স্বর্ণ সুযোগ হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যায়।

দেশের এই ঘটনা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী ব্রিটিশ লেবার পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতাদেরও মুখোশ খুলে দেয়। জাতীয় আন্দোলনের এই বিপ্লবী ঘটনা সমূহের সময় ব্রিটেনে এটলি সরকার ছিল—যিনি লেবার পার্টির নেতা ছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের এই নেতা নিজের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে এবং সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক হিসাবে প্রতিপন্ন হন।

ভারতবর্ষে বিপ্লবের অবস্থা পরিপক্ক দেখে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং কংগ্রেস নেতা দুজনেই ভয় পায়। তারা দুজনেই জানত বিপ্লবের জ্বালামুখীর অগ্নুৎপাত হলে তাদের কোন নামগন্ধই থাকবে না। সে জন্যে তারা জ্বালামুখীকে ঠাণ্ডা করার জন্যে পরস্পরে আপস-রফার রাস্তায় আসে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬-এ নৌ-সৈনিকদের হরতাল আরম্ভ হয় এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী এটলি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে কেবিনেট মিশন নতুন দিল্লীতে পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। এই মিশন ২৩শে মার্চ ১৯৪৬-এ দিল্লী এসে পৌছায়। এর সদস্য ছিলেন লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফর্ড ক্রিপস্ এবং এ. বি. আলেকজাণ্ডার। এই মিশন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতাদের কাছে এক ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রস্তাব রাখেন। সমস্ত দেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করে পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান 'বি' অঞ্চলে, বাঙলা এবং আসাম 'সি' অঞ্চলে অঞ্চলে এবং বাদবাকী সব 'এ' অঞ্চলে রাখা হয়।

কংগ্রেস নেতারা যে কোন রকমের সমঝোতার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁরা এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নেন। প্রথমে তাঁরা মধ্যবর্তী সরকারে সামিল হওরার জন্যে ইতস্তত করেন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেই ইতস্তত দূর হয়ে যায়।

মুসলিম লীগও সর্ব সম্মতিক্রমে স্বীকার করে নেয়। তাদের মনে হয়, তারা যা কিছু চাইছিল তা পেয়ে যাচ্ছে। তাদের নেতারা মধ্যবর্তী সরকার গঠন করার জন্যে উতলা হয়ে ওঠেন। তাঁরা ভেবেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পরিকল্পনাকে অস্বীকার করবে। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশের উপর তাঁরা রাজত্ব করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু যখন কংগ্রেস তথাকথিত মধ্যবর্তী সরকারে সামিল হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন মুসলিম লীগ মত পালটায়, তারা কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে বাতিল করে এবং পাকিস্তানের জন্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে নামার জন্যে প্রস্তুত হয়।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মত পার্থক্যের সম্পূর্ণভাবে সুযোগ নেয়। ১২ই আগস্ট, ১৯৪৬-এ ভাইসরয় মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্য জওহরলাল নেহেরুকে আমন্ত্রন জানান। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগ সারা দেশে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' আহ্বান করে, 'লড়কর লেংগে পাকিস্তান'-এর স্লোগান তুলে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়া দেয়। কলকাতার ভয়ঙ্কর দাঙ্গা ছিল এরই পরিণতি। এর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একের পর এক

শুরু হয়। কলকাতার পরে নোয়াখালি এবং নোয়াখালির পর বিহার। জাতীয় আন্দোলনের বিপ্লবী শক্তিসমূহের এই দাঙ্গায় ভীষণভাবে আঘাত লাগা স্বাভাবিক ছিল।

অক্টোবর, ১৯৪৬-এর মধ্যে মুসলিম লীগও মধ্যবর্তী সরকারে সামিল হয়ে যায়। কিন্তু এই সরকারের মধ্যে থেকেও কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা আপসে ঝগড়া করতে থাকেন। স্থবিরতাকে দূর করবার জন্যে ৩-৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৬-এ লণ্ডনে এক সম্মেলনে আহ্বান করা হয়, যে সম্মেলনে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এটলি, ভারতের ভাইসরয় বেবেল, কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এবং মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদআলী জিন্না যোগ দেন। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা একদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নিজ নিজ অধিকারের জন্যে আপসে লড়াই করতে থাকেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে খোসামদ করতে থাকেন আর অন্যদিকে তাঁদের মধ্যবর্তী সরকার গণ আন্দোলনের উপর দমন বৃদ্ধি করে বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশে গণ আন্দোলনকে বৃদ্ধি করে বিপ্লবী শক্তি সমূহকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। দেশের ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতাদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু এই দুই পার্টির নেতারা সম্পূর্ণভাবে বিপরিত রাস্তায় যান। তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টির উপর হামলা চালায়। জানুয়ারী ১৯৪৭-এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের গ্রেফতার শুরু হয়। মধ্যবর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভ ভাই প্যাটেল ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭-এ কেন্দ্রীয় বিধান সভায় বলেন যে, ১,৯৫০জন কমিউনিস্টকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং আপস-রফা সত্ত্বেও গণ অন্দোলন তীব্র হতে থাকে। তেলেঙ্গানায় কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বে কৃষকরা নিজামের রাজাকারদের পরাজয়ের পরাজয় করে এক বিরাট অঞ্চলকে মুক্ত করে নেয়, গ্রামীন সোভিয়েত স্থাপন করে। তাদের এই সংগ্রাম দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদকে সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্ত করার এবং হায়দ্রাবাদকে ভারতের অংশে পরিণত করার জন্যে ছিল, আর নিজাম এক স্বতন্ত্র রাজ্য বানানোর চেষ্টা করছিল।

বৈপ্লবিক নেতৃত্বে গণ আন্দোলনের নতুন জোয়ার উঠতে দেখে ব্রিটিশ

শাসকগোষ্ঠী তাড়াতাড়ি সমাধানের জন্যে অগ্রসর হয়। ওয়েভেলের জায়গায় মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় নিযুক্ত হন। ৩রা জুন ১৯৪৭-এ মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় এবং আড়াই মাসের মধ্যে তা কার্যকরী করা হয়। দেশকে দুই টুকরা করা হয়। ১৪ই অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের শাসন ভার মুসলিম লীগের নেতাদের এবং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের শাসন ভার কংগ্রেসের নেতাদের হাতে অর্পণ করা হয়।

এইভাবে ভারতবর্ষের পুঁজিপতি এবং সামন্ত-জমিদাররা দুটি রাষ্ট্র পায়—পাকিস্তান এবং ভারত। ইংরেজদের রাজনৈতিক শাসন শেষ হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রথম পর্ব, সাধারণ জাতীয় যুক্তফ্রণ্টের পর্ব—যার বর্ষামুখ ছিল প্রধানত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে।

ইংরেজদের রাজনৈতিক শাসন সমাপ্ত হওয়ার পর ভারত এবং পাকিস্তানের—দুই জায়গারই জনসাধারণ আনন্দিত হয়। তাদের আশা ছিল জাতীয় আন্দোলনের নেতারা শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর সাম্রাজবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অভিশাপকে খতম করবে এবং তাদের জীবনকে আনন্দময় করবে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যোগসাজশে খুব শীঘ্রই দুই দেশের জনসাধারণের উপর—হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগান হয়, তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তাদের খুন করা হয়। মা-বোনের ইজ্জত নষ্ট করা হয়। লাখ লাখ হিন্দু এবং শিখদের পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসতে হয় আর লাখ লাখ মুসলমানদের ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে হয়। নির্দোষ মানুষের এই খুনের জন্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের উপর বর্তায়—যাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে দু টুকরো করা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

যদি কংগ্রেসের নেতারা সমঝোতার রাস্তায় না গিয়ে বৈপ্লবিক পথে যেতেন তবে কি হত, দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর যত মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে মারা গিয়েছে, তার থেকে কম মানুষের আত্মদানে দেশ স্বাধীন হয়ে যেত, দেশ অখণ্ড থাকত, দ্বিখণ্ডিত হত না। তবে দেশের উপর শোষক পুঁজিপতি এবং জমিদারদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করে ভারতের শাসনভার পাওয়ার পর কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশের বৈপ্লবিক শক্তিকে একজোট করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব

সম্পূর্ণ করার জন্যে এগিয়ে না গিয়ে বরং বিপরীত পথে পা বাড়ালেন। তাঁরা বিপ্লবী শক্তির উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমন শুরু করেন। তাঁরা তেলেঙ্গানায় সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পুনরায় নিজাম এবং জমিদারদের রাজ কায়েম করেন এবং গ্রামীন সোভিয়েতকে ধ্বংস করেন। তাঁরা নিজাম এবং রাজাকারদের নিজেদের বন্ধু এবং কৃষক ও কমিউনিস্টদের নিজেদের দুষমন মনে করেন।

হিউম বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্যে কংগ্রেসকে জন্ম দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতারা সর্বদা বৈপ্লবিক চিন্তা এবং শক্তিসমূহকে দুর্বল করার জন্যে চেষ্টা করেন এবং শেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধ পরিকর হন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশা ছিল যে, আমাদের অর্থনীতিকে নিজেদের হাতের মুঠোয় এনে তার দৌলতে আমাদের স্বাধীনতাকে কাগুজে স্বাধীনতায় পরিণত করতে সমর্থ হবে। কিন্তু দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে যে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন চলছিল, তা তাদের আশার উপর জল ঢেলে দিল। মহান চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয় এবং বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণের জন্যে ভারতের পুঁজিপতি এবং জমিদাদের প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে সমর্থ হয়।

১৯৫০, ২৬শে জানুয়ারীতে ভারত স্বাধীন গণতন্ত্র ঘোষণা করে এবং দেশে নতুন সংবিধান চালু করে—যা স্বয়ং ভারতের কনষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি তৈরী করে। এই ব্যাপারেও কংগ্রেস নেতারা পুঁজিপতি এবং জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাঁদের পুরানো ওয়াদা রাখেন না। তাঁরা ওয়াদা দিয়েছিলেন কনষ্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে সদস্য নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতেই হবে, যখন তা কার্যকারী করার প্রশ্ন উঠে, তখন মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিদের এর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে ঐ ওয়াদা ছুঁড়ে ফেলা হয়।

এইসব দুর্বলতা সত্বেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে স্বাধীনতা আসা এবং পুনরায় স্বাধীন গণতন্ত্র ঘোষণা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের জন্যেই নয়, সারা দুনিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারতবর্ষকে সুখী সমৃদ্ধি পরিণত করতে, দেশের স্বাধীনতা সুদৃঢ় করতে, এক স্বাধীন সুখী এবং শক্তিশালী ভারতবর্ষ নির্মাণ করার কি পথ ছিল? ভারতবর্ষের বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বের কাজকে সম্পূর্ণ করা অর্থাৎ জাতীয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার পথে নিয়ে যাওয়া। এই কাজ কি ছিল? বিদেশী

পুঁজিকে জাতীয়করণ করে তার লুণ্ঠনকে বন্ধ করা এবং জমিদারী ব্যবস্থা ধ্বংস করে জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। ব্রিটিশ পুঁজিকে জাতীয়করণে ভারতের হাতে কলকারখানা এবং বিদেশী ব্যবসার এক বিরাট ক্ষেত্র এসে যেত—যার মুনাফা দেশকে শোষণ না করে নতুন নতুন কল-কারখানা তৈরী করার পুঁজি দিন দিন বৃদ্ধি পেত। যদি জমিদারী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে কৃষি বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা যেত তবে কৃষকদের পরিশ্রমে দেশের জমিতে সোনা ফলতে শুরু করত, খাদ্য এবং কলকারখানার জন্যে কাঁচামালের সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানার তৈরী জিনিষপত্রের বিক্রির জন্যে দেশের অভ্যন্তরেই এক বিরাট বাজার তৈরী হযে যেত।

আন্তর্জাতিক এবং দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এই কাজকে সম্পূর্ণ করার অনুকূলে ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সারা দেশের এবং দেশের জনসাধারণের স্বার্থ দেখেন না, তাঁরা শুধুমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণী এবং জমিদারদের সংকীর্ণ স্বার্থ দেখেন এবং সম্পূর্ণ বিপরিত রাস্তায যান। বৈদেশিক পুঁজির লুণ্ঠনকে ধ্বংস করার জায়গায তাঁরা তাকে বৃদ্ধি করেন এবং এর সঙ্গে দেশী পুঁজিপতিদের গাঁঠছড়া বাঁধান। প্রথমে এই দেশকে শুধুমাত্র ব্রিটিশ পুঁজি লুণ্ঠন করেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকেও দেশে নিয়ে এলেন। আর এখন তো জার্মান এবং জাপানী পুঁজিকেও ডেকে এনেছেন। দেশকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লুণ্ঠনের আখড়া তৈরী করা হয়েছে।

জমিদারী ব্যবস্থা ধ্বংস করে জমি ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার জাযগায় কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী কাগজ-কলমে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন এবং জমি জমিদারদের কাজেই রাখতে দেন। সামন্ত-জমিদারদের এখন এই পুঁজিবাদী জমিদারে পরিণত করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বড় বড় দেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সৃষ্টি করেন। যারা বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলেমিশে দেশকে আরও বিপন্ন করে তুলছে।

লক্ষ্য করার বিষয় এই, যে কংগ্রেস নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই-এ যে কোন রকম হিংসার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা বৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য হিংসার অবতার হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা এই ঐতিহাসিক তথ্যকে সত্য প্রমাণিত করে, যে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শিক্ষক খুব সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে ছিলেন। এই তথ্য এই যে, যদি পুঁজিপতিশ্রেণী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বে থাকে তবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করার দিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যায় না। ০

ভারতবর্ষের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এই জন্যে আজও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। এই বিপ্লবের সামনে আজ তিনটি মুখ্য কাজ হচ্ছে (১) বিদেশী পুঁজিকে জাতীয়করণ করা এবং এই ভাবে দেশের অর্থনীতির উপর তাদের দৃঢ় শৃঙ্খল ভাঙা, (২) একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শিল্পকে জাতীয়করণ করা এবং তার শক্তিকে ধ্বংস করা এবং (৩) জমিদার সামন্তদের সমস্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে ভূমিহীন এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া—মৌলিক ভূমি সংস্কার করে কৃষি বিপ্লকে সম্পূর্ণ করা। এই কাজকে সম্পূর্ণ করলেই দেশ সমৃদ্ধশালীতে পরিণত হতে পারে এবং দ্রুততার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। যাঁরা এই কাজকে সম্পূর্ণ না করেই সমাজতন্ত্রর নির্মাণের কথা বলেন, তাঁরা ভণ্ড এবং পুঁজিপতি-সামন্তদের সেবাদাস।

আজকের পরিস্থিতিতে বিপ্লবের শক্তিসমূহ শ্রমিক কৃষক ছাত্র মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদে ব্যবসায়ী। এই শক্তি সমূহেকে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত করে মার্কসবাদ-লেলিনবা.দর পথেই অসমাপ্ত বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা এবং সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।